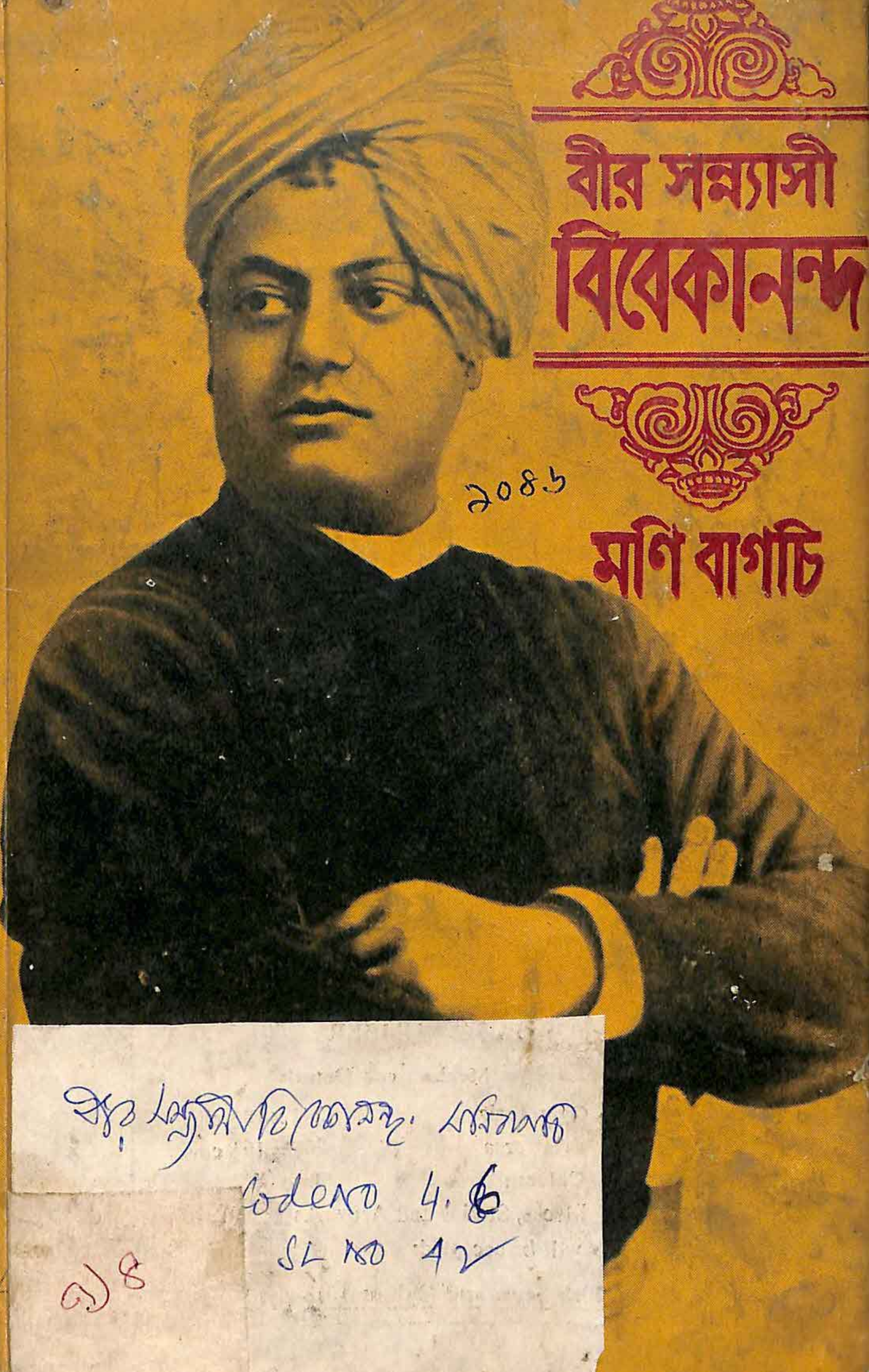
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ



মণি বাগচি

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

মণি বাগচি

ঃ পরিবেশক ঃ

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২

প্রকাশক :
রবীন বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর :
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

(শোভন সংস্করণ : ৮০০)



May (that we studied) that purify us
May it become food in us
May it join us with strength
May our study make us glorious
May we not be jealous of each other

Vivekananda

বাবিয়ার (অর্ণব রায়)
স্মৃতিতে

ভূমিকা

নবভারতের শঙ্করাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ।

বাংলা মায়ের দুর্দান্ত সাহসী তেজস্বী ছেলে।

ভারতের আকাশে পূর্বতোরণে নব সূর্যোদয় তিনি। তিনিই একদিন গোটা ভারতবর্ষটাকে কাঁধে নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'ভারতবর্ষকে চিনতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে অবশ্যই জানতে হবে।' ভারতের কোটি কোটি নর-নারীর কল্যাণে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তিনি। বনের বেদান্তকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন ঘরে। তাঁর এক হাতে ছিল শঙ্খ-পদ্ম; অন্যহাতে ঝড়-বিদ্যুৎ। বিপ্লবের দামামা তিনি যেমন বাজিয়েছিলেন, তেমনি তাঁরই কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল শান্তির ললিত বাণী। বিশ্বের দরবারে তিনি ঘোষণা করেছিলেন স্বদেশের জয়ধ্বনি—মাভৈঃ মন্ত্রের ডঙ্কা বাজিয়ে শঙ্কা হরণ করেছিলেন তিনি তাঁর স্বজাতির। যজ্ঞাহুতির হোমশিখার মতো তেজস্বী এই সন্ন্যাসীর কণ্ঠের বলিষ্ঠ ভাষা সেদিন আমাদের প্রাণে এনে দিয়েছিল আশা, উৎসাহ, উদ্দীপনা আর বিশ্বাস।

আমাদের জাতীয় জীবনের একটা উজ্জ্বল অধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ইতিহাস—এই কথাটা মনে রেখে তোমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করবে এই চরিত কথা।

মণি বাগচি
৯০ বাগুইহাটি রোড
কলিকাতা-২৮

বিবেকানন্দ

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীবীর চীর-গৈরিকধারী
জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী।
যজ্ঞাহুতির হোম-শিখাসম
তুমি তেজস্বী তাপস পরম,
ভারত-অরিন্দম, নমো নমঃ, বিশ্ব-মঠ-বিহারী॥
মদগর্বিত বল-দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি।
নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ,
মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ ;
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি॥

—নজরুল ইস্‌লাম।

এক

—ঠাকুর, দেখেছ তুমি ঈশ্বরকে ?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—সত্যি দেখেছ ?

—হ্যাঁরে, জলজ্যান্ত দেখেছি—এই যেমনটি তোকে দেখছি।

—দেখেছ ? তার প্রমাণ দিতে পারো ?

—পারি।

এক শিক্ষিত যুবক একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে এই প্রশ্ন করেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসকে।

এই যুবকের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

উত্তরকালে ইনিই স্বামী বিবেকানন্দ রূপে সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছিলেন।

ইতিহাস সেদিন তাঁর আবির্ভাবের জন্য যেন আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল—যেমন করে রাত্রি তপস্যা করে থাকে সকালবেলার সূর্যের জন্য, শুকতারা তাকিয়ে থাকে অপলক চোখে পূর্ব আকাশের দিকে, ঠিক তেমনি ভাবেই ভারতবর্ষের ইতিহাস সেদিন ছিল এঁরই জন্মের প্রতীক্ষায়। তাঁর আগে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণকে দর্শন করতে

কত লোক এসেছে, চলে গিয়েছে, কিন্তু তাঁর আকুল দৃষ্টি খুঁজেছে শুধু একজনকেই। তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে উপলক্ষ্য করেই সেদিন ভারতবর্ষের নবজন্ম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি—প্রত্যক্ষ করেছি ভারতবাসীর ধর্মীয় চেতনায় একটা বিরাট যুগান্তর। রামকৃষ্ণের কথা তোমরা পড়েছ, এইবার শোনো বিবেকানন্দের কথা।

শিমুলিয়ার দত্ত বাড়ি।

সেকালের কলকাতায় অনেক নাম-করা বংশ ছিল—যেমন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, সিংহীবাড়ি, কলুটোলার সেন পরিবার, রামবাগানের দত্ত পরিবার, শোভা বাজারের দেব পরিবার। তেমনি শিমুলিয়াতে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে ছিল দত্ত পরিবার। এইসব পরিবারে কত নাম-করা লোক জন্মেছিলেন। তাঁরা একদিকে তাঁদের বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। অন্যদিকে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে গিয়েছেন। শিমুলিয়ার দত্তবংশের বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন একজন কৃতী সন্তান।

প্রতিভাধর পুরুষ। আইনের ব্যবসা করতেন। তখনকার দিনে শহর কলকাতায় এ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের খুব নাম ডাক ছিল। যেমন ছিল তাঁর রোজগার, তেমনি দান-ধ্যান। আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, বন্ধু-বান্ধব, গাড়ি-ঘোড়া—এইসব নিয়ে রীতিমতো জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করতেন বিশ্বনাথ দত্ত। লক্ষ্মীর কৃপা যেন শতধারে বর্ষিত হয়েছিল তাঁর শিরে। ঐশ্বর্য ও খ্যাতির তুলনা ছিল না তাঁর। সমাজে প্রতিপত্তিও কম ছিল না। পার্থিব সুখের কোন অভাবই ভগবান তাঁর রাখেন নি। এই যেমন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর ছিল প্রবল পাঠানুরাগ আর সংগীতে অনুরাগ। দেশ-বিদেশের অনেক নাম-করা গানের ওস্তাদ তাঁর বাড়িতে এসে গানের মজলিস বসাতেন মাঝে মাঝে।

দত্ত-গৃহিনী ভুবনেশ্বরী দেবী।

যেমন রূপ তাঁর, তেমনি তাঁর গুণ। সামান্য বাংলা লেখাপড়া তিনি জানতেন, কিন্তু নিজের ছিল স্বাভাবিক বুদ্ধি আর জ্ঞানস্পৃহা। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি তিনি রোজ পড়তেন। তাঁর চরিত্রে ছিল আভিজাত্যের একটা সহজ গৌরব অথচ তাঁর মধ্যে দেমাক বা অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। খুব ধর্মপরায়ণা ছিলেন তিনি। দয়া -দাক্ষিণ্য ছিল তেমনি। দেবতা ও ব্রাহ্মণে ছিল অখণ্ড ভক্তি। প্রতি-দিন নিজের হাতে শিবের পূজা করতেন। প্রতিবেশিনীরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো।

এই বিশ্বনাথ দত্ত আর ভুবনেশ্বরী দেবী নরেন্দ্রনাথের পিতামাতা।

এত সুখৈশ্বর্যের মধ্যেও তাঁদের মনে শান্তি ছিল না। এর কারণ একটি ছেলের অভাব ছিল তাঁদের। ভুবনেশ্বরীর প্রথম সন্তান ছিল পুত্র—সেটি এক বছর বয়সে মারা যায়। তারপর চারটি মেয়ে হলো একে-একে। ঠাকুরঘরে বসে ইষ্টদেবতার কাছে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা জানাতেন ভুবনেশ্বরী। ঠাকুর! এত দিনে একটি ছেলে দিলে না আমাদের; যদি বা একটা দিয়েছিলে, সেটাকে কেড়ে নিলে।

ছেলের মুখ দেখতে পেলেন না বলে তাঁর দুঃখের যেন শেষ ছিল না। প্রতিদিন সকালবেলায় গৃহদেবতা বীরেশ্বরের চরণে প্রণাম করে তিনি প্রার্থনা করতেন একটি সন্তান। কতো তীর্থস্থান ঘুরে এলেন ভুবনেশ্বরী আর কতো না মানত করলেন বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে। তবু কিছু হলো না—তিনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত রইলেন। এত সুখ, এত ঐশ্বর্যের মধ্যে এই একটি মাত্র অভাবের জন্য তাঁর মাতৃ-হৃদয়ে যেন দুঃখের শেষ ছিল না। তাই একটি ছেলের জন্য গৃহদেবতার চরণে তাঁর প্রার্থনারও শেষ ছিল না। দেবতা যেন শুনতে পেলেন মায়ের সেই আকুল প্রার্থনা। একদিন গভীর রাতে ভুবনেশ্বরী স্বপ্নে দেখতে পেলেন। তুষারধবল রজতকান্তি মহাদেব যেন তাঁর সামনে এসে বলছেন, কাশীর বীরেশ্বর মহাদেবের কাছে মানত করো, ছেলের মুখ

দেখতে পাবে। কাঁটা দিয়ে উঠলো তাঁর সমস্ত শরীর। স্বপ্ন কি সত্যি হয়? —সংশয়পূর্ণ মনে ভাবেন তিনি।

কাশীতে তাঁদের এক আত্মীয়া থাকতেন। তাঁকেই ভুবনেশ্বরী চিঠি লিখলেন তাঁর হয়ে বীরেশ্বর মহাদেবের কাছে একটি ছেলের জন্য মানত করতে। তাঁর পূজার জন্য কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিলেন। জাগ্রত দেবতা বীরেশ্বর মায়ের প্রার্থনা শুনলেন। কৃপা করলেন ভুবনেশ্বরীকে। তারপর একদিন পুণ্যলগ্নে ভুবনেশ্বরীর কোল আলো করে, দত্ত বাড়িতে আনন্দের বাণ ছুটিয়ে, জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর ষষ্ঠ সন্তান—নরেন্দ্রনাথ। সেদিনটা ছিল পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন—১২ই জানুআরি। ১৮৫৩ সাল। সবেমাত্র প্রভাতের সোনার আলো পৃথিবীর বুকে ফুটে উঠেছে। সেই শুভক্ষণে জন্ম নিলেন ক্ষণজন্মা নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আনন্দের কলধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে শিমুলিয়ার দত্তবাড়ি। বেজে ওঠে মঙ্গলশঙ্খ। আবির্ভাব হলো ইতিহাসের এক চিহ্নিত মহামানবের।

দত্ত-বাড়ির কথা এখন থাক।

এইবার একটু ইতিহাসের কথা বলি। এই ইতিহাসটুকু না জানলে তোমরা এই মহামানবের জীবনের তাৎপর্য বা মর্মকথা ঠিকমত বুঝতে পারবে না। বিবেকানন্দ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন উনিশ শতকের অর্ধেক শেষ হয়ে আরো বারোটা বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। বাংলার নবযুগের যুগসারথিরা এই সময়ের মধ্যে একে একে ইতিহাসের জঠর থেকে আবির্ভূত হয়ে নবযুগ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। তখন সবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতবর্ষের নতুন রাজধানী কলকাতা। জব চার্ণক নামে এক ইংরেজ এই শহরের পত্তন করে ছিলেন। ইংরেজ রাজত্বও কায়েম হয়েছে এই দেশে। একটা যুগের অবসানে আরম্ভ হয়েছে আরেকটা নতুন যুগ। বাঙালী তখন অনেকটা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল—হিন্দুজাতি ভুলে গিয়েছিল তাদের প্রাচীন

গৌরবের ইতিহাস। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এদেশে এসে প্রচার করছে যীশুর বাণী আর শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে করে চলেছে তাদের ধর্মের প্রচার। উনিশ শতকের সূচনায় স্থাপিত হলো ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এলেন এদেশে মহামতি ডেভিড হেয়ার—নব্য বাংলার প্রথম দীক্ষাগুরু।

ক্রমে পাদ্রীদের প্রচারকার্য জোর হতে থাকে—তারা ছড়িয়ে দেয় এই দেশে ধর্ম-বিদ্বেষ। হিন্দুর আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সবই কুসংস্কারে ভরা, হিন্দুর ধর্ম পুতুলপূজো ছাড়া কিছু নয়। এইভাবে তারা আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের ওপর। কেউ এর প্রতিবাদ করে না। করতে সাহস পায় না। গোটা হিন্দু-সমাজেও তখন শুরু হয়েছে ভাঙন। শহর কলকাতার বাবুরা মত্ত থাকতেন নানারকম আমোদ-প্রমোদের মধ্যে। তাঁদের না ছিল শিক্ষা, না ছিল রুচির বালাই। সমস্ত দেশ যেন ঘুমিয়ে আছে, সমস্ত জাতি যেন অসাড়। সেই সময়ে কলকাতা শহরে আবির্ভূত হলেন এক যুগপুরুষ।

ইনি রাজা রামমোহন রায়।

এঁর সময় থেকেই আমাদের দেশে নবযুগের আরম্ভ। নবযুগের প্রথম প্রবর্তক তিনিই। তিনি বহুভাষা জানতেন এবং পৃথিবীতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তাঁর আগে আর কোনো দেশে কোনো পণ্ডিত ঠিক এই ধরনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি। ১৮১৬ সালে রামমোহন কলকাতায় এসে 'আত্মীয় সভা' নামে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনুরাগীদের নিয়ে প্রচার করতে থাকেন উপনিষদের ধর্ম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্তি পূজা ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধেও প্রবল আন্দোলন করতে থাকেন। হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে যেমন, খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রচারিত মতবাদের বিরুদ্ধেও তিনি তেমনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এইভাবেই উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এই অসীম শক্তিশালী পুরুষের চিন্তা ও চরিত্র হিন্দুসমাজের অচলায়তনকে আঘাত করে জাগিয়ে তুলেছিল এক নতুন জীবনের

স্পন্দন। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে ও শিক্ষায়— সকল ক্ষেত্রেই তিনি নিয়ে এসেছিলেন একটা বিপ্লব, আমূল পরিবর্তন। হীনতা ও জড়তার পঙ্কশয্যা থেকে তিনি তাঁর স্বজাতিকে টেনে তুলবার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। দেশহিতকর অনেক কাজ করেছিলেন তিনি। নবযুগের অগ্রগামী নির্ভীক পথিক ছিলেন রামমোহন।

রামমোহনের পর একে একে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এলেন অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, দীনবন্ধু মিত্র, এলেন সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, রমেশচন্দ্র, এলেন বাংলার নবযুগের সাধনা ও সিদ্ধির মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সংস্কারযুগের এইসব বরণীয় মহাপুরুষদের সাধনার পরিণত ফল ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

উনিশ শতকের শেষভাগে, যখন আমরা সংস্কারের আবর্তে পড়ে কোন পথে যাব তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না, পাশ্চাত্যের প্রখর বিদ্যুতের আলোয় আমাদের চোখ যখন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, সমস্ত জাতির যখন দিগ্‌ভ্রম হবার উপক্রম— জাতির সামনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন সন্দেহের পর সন্দেহ যখন ক্রমেই জমে উঠছিল—আমরা যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক রকম হতাশ হয়ে উঠেছিলাম—তখন, ইতিহাসের সেই মহেন্দ্রক্ষণে বাঙালী হিন্দু সমাজের জঠর থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

দুই

কতকাল পরে ছেলের মুখ দেখলেন ভুবনেশ্বরী দেবী।

ঘটা করে তিনি ছেলের অন্নপ্রাশন করলেন। বিশ্বনাথ দত্ত দরাজ হাতে খরচ করলেন এই উৎসবে। স্বপ্নের কথা স্মরণ করে ছেলের নাম রাখা হয়েছিল বীরেশ্বর; এখন অন্নপ্রাশনের সময় নতুন করে নাম রাখা হলো, নরেন—নরেন্দ্রনাথ। উত্তরকালে শিশু এই নামেই পরিচিত হয়েছিল।

দেখতে দেখতে নরেন বড়ো হয়ে উঠলো। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে উঠলো দুরন্ত, চঞ্চল আর স্বেচ্ছাচারী। কারো কথা শুনবে না, কারো নিষেধ মানবে না। প্রতিবেশীরা পর্যন্ত উত্ত্যক্ত হয়ে উঠলো তার দৌরাত্ম্যে। একমাত্র ছেলে, বাবা তাই খুব বেশি শাসন করতেন না। ছেলের দুষ্টুমিতে অস্থির হয়ে ভুবনেশ্বরী একদিন বললেন, শিব আমার কথা শুনলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে না এসে একটা ভূতকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দ্যাখ বিলে, তুই যদি দুষ্টুমি করিস, সবাইকে উত্ত্যক্ত করিস, তবে মহাদেব তোকে কৈলাসে ঢুকতে দেবেন না কখনো।

নরেনের ডাক নাম ছিল বিলে।

একদিন পূজোয় বসেছেন ভুবনেশ্বরী দেবী। তিনি নিত্য শিবপূজা করতেন। ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে বিলে এসে একটা বায়না ধরলো। সে বিষম বায়না। একটানা বায়না করতে থাকে। পূজোর ব্যাঘাত হয়। তখন ভুবনেশ্বরী শিব পূজোর সব ফুল বেলপাতা তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বলতে থাকেন—শিব! শিব!!

যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করল মায়ের মুখে উচ্চারিত সেই পবিত্র শিবনাম। দুরন্ত নরেন একেবারে শান্ত হয়ে গেল। আয়ত চোখ দুটি মেলে সে তাকিয়ে থাকে তার মায়ের দিকে। মা হাসলেন; প্রসন্ন সেই হাসি। ভাবলেন মনে মনে, শিবের অংশে নরেনের জন্ম; এ ছেলে একদিন নিশ্চয়ই বংশের ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করবে। আরো ভাবলেন, এখন ছোট আছে, একটু বড়ো হলেই দুষ্টুমি আর করবে না। মায়ের এই দুটো আশা-ই পূর্ণ হয়েছিল।

কতদিন ছেলেকে কাছে বসিয়ে ভুবনেশ্বরী মুখে মুখে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শোনাতেন। বালক নরেন্দ্র মুগ্ধ হয়ে শুনত সে-সব কাহিনী। তখন সে আর দুষ্টু বিলে নয়, একেবারে শান্তশিষ্ট ছেলে। রামায়ণে বর্ণিত ভক্ত হনুমানের কথা তার বেশ ভাল লাগতো। সরল বালকের মনে রাম-ভক্ত হনুমানের ছবিটা যেন আঁকা হয়ে যায়। সে ব্যাকুল হয় হনুমানকে দেখবার জন্য। তাদের বাড়ির কাছেই একটা বাগান ছিল। একদিন হনুমানকে দেখার আশায় সারাটি দিন সেই বাগানের মধ্যে বসে রইল। মনের মধ্যে অসীম কৌতূহল নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুণতে লাগল, কখন হনুমান আসবে। কখন সে এসে তার সঙ্গে কথা বলবে। সারাদিন কেটে গেল। হনুমানের আর দেখা নেই। নিরাশ হয়ে বালক ফিরে আসে তার মায়ের কাছে। বলে, মা, হনুমান তো এলো না।

ছেলের সরল বিশ্বাস দেখে মা বিস্মিত হলেন।

কিছু না বলে ছেলেকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন।

বিলের দুষ্টুমির জন্য মা সব সময় নির্বিবাদে সংসারের কাজ করতে পারতেন না। একদিন তার উৎপাতে অস্থির হয়ে তাকে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন ভুবনেশ্বরী। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে তালাচাবি লাগিয়ে দিলেন। সেই ঘরটা ছিল তাদের বাড়ির বৈঠকখানার পাশেই; সেই ঘরের জানলার পাশেই রাস্তা। নরেন এসে দাঁড়ায় জানলার কাছে। দেখে কত মানুষ চলেছে রাস্তা দিয়ে। একটা ভিখারী এসে দাঁড়ায় ঠিক জানলার সামনে। বলে, একখানা কাপড় দেবে বাবা? গায়ে কিছু নেই। বড় কষ্ট পাচ্ছি।

ভিখারীর সকরুণ প্রার্থনায় গলে যায় বালকের মন। চোখ দুটি তার ভরে ওঠে সমবেদনার অশ্রুতে। ঘরের মধ্যে জামাকাপড় সমেত একটা আলনা ছিল। তার থেকে একখানা ভালো কাপড় নিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে ভিখারীর হাতে দিয়ে বলে, এই নাও। ভিখারীটির আনন্দ ধরে না সেই কাপড়টি পেয়ে। আশীর্বাদ করে মন খুলে। সে চলে যেতে না যেতেই আর একদল ভিখারী এসে দাঁড়ায় জানলার কাছে। তাদেরও মুখে সেই এক কথা—কাপড় দাও।

নরেন তখন আলনায় যত জামা কাপড় ছিল সব নিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের দেবার জন্য। বাড়ির এক ঝি ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে ছুটে ভেতরে এসে গিন্নী-মাকে খবর দেয়, মা শীগ্‌গির ঘরে যান। দাদাবাবুর কাণ্ডখানা দেখুন গিয়ে। সব জামাকাপড় বিলিয়ে দিচ্ছেন ভিখারীদের।

গরীব দুঃখীদের জন্য এমনি সহৃদয়তা, এমনি করুণাভরা প্রাণ নিয়ে জন্মেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তাদের দুরবস্থা দেখলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। এমনকি তিনি যখন বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তখনো পর্যন্ত তাঁকে ভারতবর্ষের কোটি কোটি কঙ্কালসার অর্ধনগ্ন মানুষগুলির কথা চিন্তা করতে দেখা যেত।

ঝিয়ের মুখে ছেলের কাণ্ড শুনলেন ভুবনেশ্বরী। তাড়াতাড়ি ঘরে এলেন। ঘরে এসে যা শুনেছেন তাই দেখলেন। নরেনকে তিনি

কিছু বললেন না। কেবল ইষ্টদেবতার উদ্দেশে করযোড়ে প্রার্থনা জানালেন, ঠাকুর, তোমার কৃপায় আমি পুত্রলাভ করেছি। আমার নরেনকে তুমি সুমতি দাও।

মায়ের মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনে ছেলেবেলা থেকেই বালক নরেনের মধ্যে জেগে উঠতো ধর্মভাব। তাঁর সেই ভাব প্রকাশ পেতো নানা রকম দেবদেবীর মূর্তি পূজার ভেতর দিয়ে। প্রথম প্রথম রাম-সীতার আদর্শ বালকের মনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। রাম-সীতার পূজাও করতো বালক বীরেশ্বর। বাজার থেকে সে রাম-সীতার একটা সুন্দর যুগল মূর্তি কিনে এনেছিল ও খেলার সঙ্গীদের নিয়ে সেটা পূজো করতো। কখনো কখনো তাকে মূর্তির সামনে চুপ করে বসে থাকতে দেখা যেত, মনে হোত বালক ধ্যানে বসেছে। কিছুদিন পরে দেখা গেল চিলেকোঠার সেই নির্জন ঘরে রাম-সীতার মূর্তি নেই—তার বদলে সেখানে শোভা পাচ্ছে রজতধবল সুন্দর একটি শিবের মূর্তি। সেই মূর্তির সামনে শান্ত হয়ে বসে থাকত নরেন্দ্র। মায়ের দেখাদেখি সেও রোজ শিবপূজা করতো; খেলার সঙ্গীদের ডেকে এনে সবাই মিলে শিবমূর্তিটিকে ঘিরে ধ্যান করতে বসতো। ছেলেবেলায় শিবপূজা ছিল তার একটি প্রিয় খেলা।

বিশ্বনাথ দত্ত ছেলের এইসব কাণ্ড কারখানা দেখে মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বলতেন, শিবের কৃপায় যাকে পেয়েছে সে দেখছি এরই মধ্যে রীতিমত শিবভক্ত হয়ে উঠছে। ভুবনেশ্বরী দেবী হেসে উত্তর দিতেন,

—তাইতো দেখছি।

—কিন্তু আমি ভাবছি বিলের এই মতিগতিটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। শিব তো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—

—না, না, অমন কথা তুমি চিন্তা করো না। বলেন ভুবনেশ্বরী স্বামীর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে।

—আমার বাবার কথা মনে পড়ে। তিনি তো সংসারী হয়েও সন্ন্যাসী ছিলেন। বাবা একদিন আমাকে বলেছিলেন—

—কি বলেছিলেন ?

—বলেছিলেন দত্তবংশে আর দুই পুরুষের মধ্যে এমন একজন জন্মাবে যে সন্ন্যাসী হবে।

—তবে কি আমাদের বিলে—ভুবনেশ্বরী এইটুকু বলে সেখান থেকে চলে গেলেন।

যত বয়স বাড়ে বালকের দুষ্টুমি তত কমে আসে, চপলতা চঞ্চলতা দূরে যায়। ছেলেবেলায় স্বামী বিবেকানন্দ অন্যান্য খেলার চেয়ে ধ্যানের খেলা খেলতে খুব ভালবাসতেন। তার একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। দত্তবাড়ির কাছেই একটা শিবমন্দির ছিল। খেলার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বিলে প্রায়ই সন্ধ্যায় সেইখানে গিয়ে শিবের সামনে বসে ধ্যান করতো। সঙ্গীদের বললো, তোরাও আমার সঙ্গে এমনি করে চোখ বুজে ধ্যান করবি। মন্দিরটা অনেক কালের ; মন্দিরের পাশে একটা বটগাছ। জায়গাটা খুব নিরাপদ ছিল না। কিন্তু বিলের মনে ভয় বলে কিছু ছিল না।

ছেলেরা চোখ বুজে আসন করে ধ্যান করছে। কিন্তু এমন মশার উৎপাত যে তারা দু'মিনিটও বসে থাকতে পারল না। দু'একজন চোখ খুলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর একা বিলে বাদে সবারই ধ্যান করা হয়ে গেল। হঠাৎ একজন দেখে একটা সাপ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সাপ দেখে সবাই ছুটে পালায়, শুধু বসে থাকে বিলে। তার কথা তাদের মনেও হলো না একবার। তাদের মধ্যে একটা ছেলে দত্তদের বাড়িতে ভুবনেশ্বরীর কাছে এসে বলে, মাসীমা, আমরা শিবমন্দিরে বসে ধ্যান করছিলাম, একটা সাপ আমাদের দিকে তেড়ে এলো।

—বিলে কোথায় ?

—সে তো মন্দিরে বসে ধ্যান করছে।

ভুবনেশ্বরী তখনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। এলেন মন্দিরে। দেখেন, বিলে মন্দিরের চাতালে বসে তন্ময় হয়ে ধ্যান করছে। হঠাৎ

দেখেন তার কোলের ওপর দিয়ে একটা সাপ চলে যাচ্ছে। মায়ের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে ভয়ার্ত চীৎকার। তবু বিলের কোনো সাড়া-শব্দ নেই। স্থির চিত্তে বসে রইলো। ভুবনেশ্বরী দেখলেন সাপটা তাঁর ছেলের কোলের ওপর দিয়ে চলে গেল নিঃশব্দে। অনেক ডাকা-ডাকির পর তার ধ্যান ভাঙলো।

সামনে মাকে দেখতে পেয়ে বালক বিস্মিত হয়। জিজ্ঞাসা করে, মা, তুমি এখানে ? ওরা সব গেল কোথায় ?

—হ্যাঁরে তুই যে অমনভাবে ধ্যান করছিলি আর ওদিকে একটা সাপ তোর গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল।

—আমি তো কিছুই টের পাইনি মা। কিন্তু ওরা কোথায় ?

—তোর বন্ধুরা তো কখন চলে গিয়েছে। তাদেরই একজন তো আমাকে খবর দিলে। তাইতো আমি ছুটে এলাম।

—তুমি দেখলে একটা সাপ আমার গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল ?

—হ্যাঁ দেখলাম তো ওটা যদি ছোবল মারতো ?

—ছোবল মারবে কেন মা ? ওটা তো মহাদেবের সাপ।

মা অবাক হলেন এই কথা শুনে। মুখে কিছু বললেন না তিনি। ছেলের হাত ধরে বাড়ি ফিরে এলেন। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো ধ্যানের সহজাত সংস্কার নিয়েই বিবেকানন্দ এসেছিলেন এই পৃথিবীতে।

দেখতে দেখতে নরেন্দ্রনাথ কৈশোরে পদার্পণ করলেন।

এইবার বিশ্বনাথ ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত হলেন। যখন নরেন্দ্রনাথের বয়স পাঁচ বছর তখন বাড়ির গুরুমশাইয়ের কাছে তাঁর লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়। দুরন্ত ছাত্রটিকে নিয়ে গুরুমশাই যারপর নেই বিব্রত বোধ করেন। মারধোর করে কোনো ফল হয় না—তাতে বরং উল্টো ফল হতো, ছাত্রটি বেঁকে বসত তখন তিনি তাকে মিষ্টি কথায় বশে আনবার চেষ্টা করতেন। তবে দুষ্টু হলেও ছাত্রটি যে মেধাবী সে বিষয়ে গুরুমশাইয়ের কোনো সন্দেহ ছিল না।

এরপর নরেন্দ্রনাথকে মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। বিদ্যাসাগরের স্কুল। স্কুলে এসে সমান বয়সের সহপাঠীদের সঙ্গলাভ করে বালকের আনন্দের সীমা নেই। তাদের নিয়ে তিনি একটা ছোট দল গড়ে তুললেন, নিজে হলেন তার নেতা। কিন্তু স্কুলে এসে নরেন্দ্রনাথের আর একটা বিপদ হলো। পদে পদে বিধি-নিষেধের বাধা এখানে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি চঞ্চল প্রকৃতির, এক জায়গায় স্থির হয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকা তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিল না। স্কুলে ক্লাসের বেঞ্চিতে ঘন্টার পর ঘন্টা স্থির হয়ে বসে থাকাটা এক রকম দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। কখনো দাঁড়াতেন, কখনো বসতেন, আবার কখনো বা শিক্ষকের অনুমতি ছাড়াই বিনা কারণে ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতেন। চার দেয়ালের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে তিনি কিছুতেই পারতেন না। মাস্টাররা বিব্রত বোধ করেন এই অস্থিরচিত্ত ছাত্রটিকে নিয়ে। শাসন করতে গিয়ে দেখেন সে তেজী ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে থাকে, শাসন মানতে চাইত না। তখন তাঁরা অন্য উপায়ে সেই দুরন্ত ও অশান্ত ছাত্রটিকে বশে আনবার চেষ্টা করেন মিষ্টি কথা বলে, গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে বাগে আনলেন তাঁরা।

অশান্ত প্রকৃতির হলেও, আর সব ছাত্র অপেক্ষা নরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে অনেক গুণ ছিল স্কুলের শিক্ষকদের দৃষ্টিতে সেটা সহজেই ধরা পড়েছিল। মেধাবী তো ছিলেনই, তা ছাড়া তাঁর চরিত্রে অনেক স্বাতন্ত্র্য ছিল। সেই বয়সেই তার মধ্যে অনেক মহত্ত্ব দেখা গিয়েছিল। তারই একটা গল্প বলি।

চড়কের মেলা বসেছে কলকাতার ময়দানে।

সঙ্গীদের নিয়ে নরেন্দ্রনাথ গেলেন সেই মেলা দেখতে। তখন তাঁর বয়স সাত কি আট বছর হবে। মাটির তৈরি কয়েকটা মহাদেবের মূর্তি কিনে তাঁরা ফিরছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল দলের একটি ছেলে ভীড়ের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আসলে ছেলেটি ফুটপাথ

থেকে রাস্তায় গিয়ে পড়েছিল আর ঠিক সেই সময়ে সামনে একখানা গাড়ি দেখে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গীসাথীরা ততক্ষণে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে চলে এসেছে। একটা সোরগোল উঠলো, গেলো গেলো—ছেলেটা গাড়ি চাপা পড়ল।

আওয়াজটা নরেনের কানে এলো। চকিতে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, পেছন ফিরে তাকালেন। ক্ষণমাত্র দেরী না করে, অসম সাহসী নরেন্দ্রনাথ মহাদেবের মূর্তিটা বগলদাবা করে ছুটে এলেন সেই দিকে। ছেলেটি তখন প্রায় ঘোড়ার পায়ের তলায় অর্ধেক যায় আর কি। চারদিকে জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, কিন্তু কেউই সাহস করে এগিয়ে গিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে না। ত্রস্তপদে ভীড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ালেন নরেন্দ্রনাথ। বাঁ হাতের বগলের মধ্যে শিব মূর্তি, ডান হাত দিয়ে তিনি ছেলেটিকে টেনে বের করলেন। আর কয়েক মুহূর্ত দেরী হলে তার মৃত্যু অনিবার্য ছিল। ছোট একটি ছেলের এমন অসম সাহসিক কাজ দেখে উপস্থিত সবাই 'ধন্য ধন্য' করে উঠলো।

বাড়িতে এসে মায়ের কাছে যখন ঘটনাটা বললেন নরেন্দ্র তখন ভুবনেশ্বরী ছেলেকে কোলের কাছে সস্নেহে টেনে নিয়ে বললেন, খুব ভালো কাজ করেছে বাবা। আরো বড়ো হয়ে সব সময়ে এই রকম মানুষের মতো কাজ করো তুমি।

মায়ের এই আশীর্বাদ পুত্রের জীবনে নিষ্ফল হয়নি।

নরেন্দ্রনাথ বড়লোকের ছেলে ছিলেন, কিন্তু বিলাসিতা তাঁর মধ্যে কিছুমাত্র ছিল না। সেই বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে হলে দরকার মনের শক্তি, দরকার শরীরের শক্তি। পাড়ার কাছেই নবগোপাল মিত্তিরের কুস্তির আখড়া। নরেন্দ্রনাথ সেইখানে ভর্তি হয়ে নিয়মিত ডন কুস্তি করতেন, লাঠি খেলতেন, মুগুর ভাঁজতেন। এই ভাবে তাঁর শরীরের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছিল ইস্পাতের মতো দৃঢ়। তিনি যখন পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে দেশে

ফিরে আসেন তখন কলকাতার ছাত্রদের এক সভায় বলেছিলেন, বাবারা, গায়ে শক্তি কর, শরীর মজবুত না হলে জীবন বৃথা। কিশোর বয়সে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে নরেন্দ্রনাথ যে দলটি গড়েছিলেন সেই দলে খেলাধূলা আর শরীরচর্চা সমান ভাবে হতো।

মনে ছিল দুর্জয় সাহস আর দেহে ছিল অপরিমেয় শক্তি। এর ফলে নরেন্দ্রনাথ ঐ বয়সে ভয় কাকে বলে তা জানতেন না। তাঁর কিশোর বয়সের নির্ভীকতার একটা ঘটনা বলি। দত্ত-বাড়ির পাশেই রায়েদের বাড়ি—গোলোক রায়, ধনী ব্যবসায়ী। রায়েদের বাড়ির একটি ছেলে নরেনের খেলার সাথী। তাদের বাড়িতে একটা চাঁপা ফুলের গাছ ছিল। ঐ গাছের ডালে পা লাগিয়ে মাথা ও হাত ঝুলিয়ে দোল খেতে নরেনের খুব ভালো লাগতো। একদিন বিকেলে বুড়ো রায়-কর্তা তাকে অত উঁচু ডালে দোল খেতে দেখে চমকে উঠলেন। বললেন, দত্তদের ছেলেটার কাণ্ড খ্যাখো—পড়লে যে হাত গোড় ভেঙে যাবে। কিন্তু সেটা বড়ো কথা ছিল না। তাঁর সখের ফুল গাছটা ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু ধমক দিলে সে নিষেধ শুনবে না, গোলোক রায় সেটা বিলক্ষণ জানতেন। তিনি তখন একটা বুদ্ধি খাটালেন।

—বাবা বীরু, ঐ গাছটায় উঠতে নেই।

—কেন কাকা? এ গাছটায় উঠলে কি হয়?

—জানো না ও গাছে একটা বেহ্মদত্যি থাকে। কী তার চেহারা। তোমার মতো আরেকটি ছেলে গাছে চড়ে দোল খেত, বেহ্মদত্যি রেগে তার ঘাড় মটকে দিয়েছিল।

নরেন্দ্র সব কথা শুনে চুপ করে রইলেন। রায়-কর্তা চলে গেলেন। তিনি ভাবলেন, বেহ্মদত্যির ভয়ে ও বোধ হয় গাছে আর উঠবে না। কিন্তু তিনি চলে যাবার পর মুহূর্তেই নরেন্দ্রনাথ সগর্বে আবার গাছের ওপর উঠে বসলেন—আগের মতোই মনের সুখে নীচের দিকে মাথা করে দোল খেতে লাগলেন। দোল খান আর মনে মনে ভাবেন, বেহ্মদত্যিটাকে একবার দেখতে পেলে হয়। তাঁর খেলার সাথী কিন্তু

সত্যি ভয় পেয়েছিল। এই সাথীটি ছিল রায়-কর্তারই ছেলে। সে নরেনকে বললো, বীরু, বলা যায় না, সেই অপদেবতা থাকলেও থাকতে পারেন। নরেন্দ্রনাথ হেসে বলেন, তুই একটা আস্ত বোকা। তোর বাবা ভয় দেখাবার জন্যই এই গল্পটা শুনিয়ে গেলেন। আয়, দোল খাই।

সঙ্গীদের নিয়ে দলবেঁধে নরেন্দ্রনাথ চলেছেন মেটেবুরুজে নবাবের চিড়িয়াখানা দেখতে। পশুশালা দেখে ফিরবার পথে একজন সঙ্গী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। নৌকোর ওপর বমি করলো। মাঝিটা বমি দেখে ঘেন্নায় সরে গেল। বললে, বমি পরিষ্কার করে দিতে হবে। তা না হলে নৌকা থেকে কাউকে নামতে দেবে না। সঙ্গীরা সকলে নাক সিটকালো। কেউ রাজী হলো না নিজেদের হাতে বমি পরিষ্কার করতে। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু রাজী হয়ে গেলেন। জামার আস্তিন তুলে লেগে গেলেন সঙ্গীর বমি পরিষ্কার করতে। সকলে অবাক হয় নরেনের কাণ্ড দেখে। সকলের প্রতি বুকভরা ভালবাসা আর সেবার ভাব নিয়েই তো জন্মেছিলেন বিবেকানন্দ। তারই পরিচয় তিনি রেখেছিলেন সেই বয়সে। কিন্তু আর একটা বিপদ দেখা দিল।

চিড়িয়াখানা দেখতে যারা গিয়েছিল তাদের সকলেরই বয়স ছিল কম। মাঝিরা তাদের ভয় দেখাতে লাগল। নরেন বিচলিত হন না। নৌকো পারে লাগতেই সকলে ডাঙায় নামবার জন্য তৈরি হয়। এর মধ্যে মাঝিরা পার থেকে অন্যান্য মাঝিদের ডাকলো। আবার ভয় দেখালো। নরেন্দ্রনাথ তখনো চুপ করে আছেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো দু'জন গোরা সৈন্য। নরেন্দ্রনাথ সাহসের ওপর নির্ভর করে সৈন্য দু'জনের কাছে এসে ইংরেজীতে বললে, মাঝিরা বড় উৎপাত করছে। আপনারা ওদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান। সৈন্য দু'জন বাঙালী ছেলেটির সাহস দেখে আর তার মুখে বিশুদ্ধ ইংরেজী কথা শুনে খুব আনন্দ পেল। ওরা তখন গাঙের ঘাটে এসে মাঝিদের শাসিয়ে

গেল। গোরা সৈন্যদের দেখে মাঝিরা ভয়ে অস্থির; যে যেদিকে পারলো সরে পড়লো।

এই সাহস নিয়ে জন্মেছিলেন নরেন্দ্রনাথ।

এই সাহসের ওপর ভর করেই তো তিনি একদিন কপর্দকহীন অবস্থায় সাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন।

রায়পুর। মধ্যপ্রদেশের একটি শহর।

বিশ্বনাথ দত্ত তখন এখানে বাস করতেন। নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন চৌদ্দ বছর তখন তিনি কঠিন উদারময় রোগে আক্রান্ত হলেন। বায়ু পরিবর্তনের জন্য ছেলেকে এখানে নিয়ে এলেন বিশ্বনাথ। রায়পুরে তখন স্কুল ছিল না, তাই পিতা স্বয়ং পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। ছেলেকে পড়াতে গিয়ে বিশ্বনাথ দেখলেন তাঁর পুত্র সত্যিই প্রতিভাবান। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া তিনি যত্নের সঙ্গে ছেলেকে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। যে দু'বছর তিনি রায়পুরে ছিলেন সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথ তাঁর বাবার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে ছিলেন। ছেলের মেধা দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে যেতেন। যেটি পড়াতেন নরেন্দ্রনাথ সেটিই শুধু আয়ত্ত করা নয়, একেবারে অধিগত করে নিতেন।

পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া বিশ্বনাথ ছেলেকে একটি মূল্যবান শিক্ষা এই সময়ে দিয়েছিলেন। সেটি হলো আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসের বলেই তো বড়ো হয়ে নরেন্দ্রনাথ খালি হাতে সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছিলেন। রায়পুরে এসে নরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার চরিত্রের অনেক মহৎ গুণের পরিচয় পেলেন এবং পুত্রের কিশোর চিত্তে বিশ্বনাথ দত্তের মহত্ত্বের ছাপ স্থায়ীভাবেই এঁকে গিয়েছিল।

রায়পুরে এসে নরেন্দ্রনাথ তাঁর হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। দু'বছর বাদে যখন তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন তখন ষোল বছরের নরেন্দ্রনাথের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ দেখে তাঁর বন্ধুরা রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন। সে নরেন আর নেই—এখন তাঁকে দেখতে যেমন বলিষ্ঠ

তেমনি প্রিয়দর্শন। এইবার তিনি মেট্রোপলিটনে এনট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হলেন এবং এক বছর পরে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সবাইকে অবাক করে দিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন জ্যামিতিটা একেবারেই পড়া হয়নি তাঁর। কি করেন! একদিন খুব পরিশ্রম করে তিনি চারখানা জ্যামিতির বই মুখস্থ করে ফেললেন। তিনি নিজেই বলেছেন: 'প্রবেশিকা পরীক্ষার আরম্ভের দু'তিন দিন মাত্র থাকতে দেখি জ্যামিতি কিছুমাত্র আয়ত্ত হয়নি। তখন সমস্ত রাত জেগে তা পড়ে ফেললাম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারখানা বই আয়ত্ত করে পরীক্ষা দিয়ে এলাম।'

তিন

এইবার নরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হলেন।

কলকাতার সেরা কলেজ—প্রেসিডেন্সি কলেজ। বিশ্বনাথ ছেলেকে এই কলেজেই ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু প্রথম বছরেই ধরলো তাঁকে ম্যালেরিয়া জ্বরে। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না। তখন বাধ্য হয়ে কলেজ ছাড়তে হলো। পরের বছর আরোগ্যলাভ করে তিনি ভর্তি হলেন জেনারেল এসেমব্লীজ ইনষ্টিটিউসনে (এখনকার নাম স্কটিশচার্চ কলেজ)। এটা ছিল সাহেবদের কলেজ।

কলেজের প্রিন্সিপাল উইলিয়াম হেস্টি।

যেমন পণ্ডিত, তেমনি কবি ও দার্শনিক। অধ্যাপনার খ্যাতি ছিল তাঁর। অল্পদিনের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ কলেজে খুব বিখ্যাত হয়ে পড়লেন তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে। অধ্যাপকগণ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চ মুখ। এত সহজে কলেজে তাঁর প্রতিপত্তি হয়েছিল কেন? তাঁর প্রতিভা তো সবাইকে মুগ্ধ করেছিল; কিন্তু সবাই আকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর সেই ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত ও অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত চেহারা দেখে, তার চরিত্রের গুণাবলী দেখে আর সকলের ওপর তাঁর গান শুনে। এই গান তিনি বাড়িতেই ওস্তাদের কাছে শিখেছিলেন। যেমন দরাজ তেমনি সুমিষ্ট

তাঁর কণ্ঠস্বর। তর্কশক্তিতেও তিনি সেই বয়সে হয়ে উঠেছিলেন অপরাজেয়। তাঁরই এক সহপাঠী—দাশরথী সান্যাল—বলতেন: 'নরেনের গান যে একবার শুনেছে আর তার পদ্মপলাশ চোখ দুটির মর্মভেদী দৃষ্টির পরিচয় যে পেয়েছে—সে-ই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে —চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে ঠিক সেইভাবে।' তাঁর এই সহপাঠী উত্তরকালে কলকাতা হাইকোর্টের একজন নাম করা উকিল হয়েছিলেন।

কলেজের সেরা ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

কিন্তু তাই বলে তিনি গ্রন্থকীট ছিলেন না। মেধাবী ছিলেন। অন্যের পক্ষে যা আয়ত্ত করতে দু'ঘণ্টা লাগত, তাঁর পক্ষে তা আয়ত্ত করতে বিশ মিনিট যথেষ্ট ছিল। স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। পড়াশুনায় যেমন ছিল মনোযোগ, তেমনি মনোযোগ ছিল শরীর-চর্চায় —ডন, কুস্তী ইত্যাদিতে তাঁর উৎসাহ আর আগ্রহের সীমা ছিল না। সেই বয়সে তাঁর দৈহিক শক্তি, সুগঠিত শরীরের সুদৃঢ় পেশী সকলের আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

লেখাপড়া, শরীরচর্চা আর সেই সঙ্গে গান-বাজনা, হাসিখুশি, হৈহুল্লোর—এইভাবে নরেন্দ্রনাথের কলেজ জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হতো। আর সব ছাত্র থেকে ছিলেন একেবারেই সম্পূর্ণ আলাদা। জীবনীশক্তিতে ভরপুর এই তরুণের সংস্পর্শে যে আসত তারই মধ্যে যেন প্রাণের সঞ্চার হয়ে যেত মুহূর্তমধ্যে। ক্লাসের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া তিনি বাইরের আরো অনেক বই ঐ সময়ে পড়ে শেষ করেছিলেন। বি. এ. পরীক্ষা দেবার আগে তাঁর বিদ্যার বহর মিল, হিউম ও হার্বার্ট স্পেন্সরের মতবাদকে পর্যন্ত ছুঁয়েছিল।

দত্ত একটি প্রতিভাবান ছাত্র, একদিন ক্লাসে এই কথা বললেন হেস্টি সাহেব। কলেজে নরেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—এই দু'জনই ছিলেন তাঁর খুব প্রিয় ছাত্র। এঁরা দু'জনে প্রিন্সিপালের কাছে দর্শন শাস্ত্র পড়তেন। ব্রজেন্দ্র ও নরেন্দ্র দু'জনে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। দু'জনে

মাত্র এক বছরের ছোট-বড়ো ছিলেন। দু'জনেই উত্তরকালে দেশের ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন তাঁর সময়ে ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ ও সর্বজনমান্য জ্ঞানী পুরুষ। তাঁকে ভারতবর্ষের সক্রেটিস বলা হতো—এমনি ছিল তাঁর জ্ঞানের পরিধি। কলেজে মাঝে মাঝে ডিবেটিং বা বিতর্ক হতো। তাতে এঁরা দু'জনেই যোগদান করতেন। হেস্টি সাহেব সেই বিতর্ক সভার সভাপতি থাকতেন। দর্শন নিয়ে একদিন বিতর্ক হয়। সেদিন নরেন্দ্রনাথ বিশেষ একটি ভারতীয় দার্শনিক মত সম্পর্কে এমন সুন্দর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলেন যা শুনে হেস্টি সাহেব পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেদিন তিনি সকলের সামনে আবার বলেছিলেন, এমন ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি।

—ভাই ব্রজেন, আমার মনের মধ্যে কেমন একটা অশান্তির ঝড় উঠেছে, একদিন এই কথা বললেন নরেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুকে। আগে যিনি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়াতে ভালবাসতেন, আজ তিনি যেন হয়ে উঠলেন নির্জনতাপ্রিয়। একটা পরিবর্তন এসেছে তাঁর মধ্যে, এটা তিনি যেন মনে মনে বুঝতে পারেন। এতদিন তিনি পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানকে সত্য বলে মেনে এসেছেন। এখন তাঁর মন ঘুরে গেছে। তিনি এখন বুঝেছেন হিন্দু ধর্মের মধ্যে এমন জিনিস আছে যা অনেক বড়ো, অনেক গভীর। যতই বয়স বাড়তে থাকে ততই নরেনের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাস প্রগাঢ় হয়ে আসে। পড়তে থাকেন হিন্দু ধর্ম ও দর্শন বিষয়ের বহু বই।

কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে একটা সংশয় জাগে—ঈশ্বর আছেন কিনা, এই বিষয়ে কোথাও সঠিক কেউ কিছু বলেনি। অশান্তির কারণ ছিল এটাই। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে ভগবান বলে কেউ আছেন —এই বোধ বা বিশ্বাস যুবক নরেন্দ্রনাথ যেন হারিয়ে ফেলতে থাকেন। আবার সত্যলাভের একটা তীব্র ব্যাকুলতাও তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল

এই সময়ে। তাঁর মনের এই অবস্থা অকপটে বন্ধুর কাছে ব্যক্ত করে তিনি একদিন তাঁকে বললেন, তাঁর মনের মধ্যে ঝড় উঠেছে।

—ছাখো নরেন, ভগবান-টগবান সব কল্পনা।

—কল্পনা! বলিস কি ব্রজেন?

—হ্যাঁরে—ভগবান হিন্দুদের কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

—তবে পথ কোথায়?

—পথ? স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির পথেই সত্যকে পাওয়া যায়। তুই শেলি পড়েছিস?

—না।

—আয় তোকে শেলির কবিতা পড়াই।

পড়লেন নরেন্দ্রনাথ শেলির কবিতা। ভালো লাগলো, কিন্তু আলো পেলেন না তার মধ্যে। মন তাঁর সন্দেহের দোলায় ছুলতে থাকে। সেই সময়ে তিনি শুরু করলেন ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া-আসা। এই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কর্মকর্তা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম তিনি শুনেছেন। জোড়াসাঁকোয় এলেন একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে শুনলেন তিনি চুঁচড়োয় আছেন। গেলেন সেখানে। গঙ্গার ওপরে একখানা মস্ত বড়ো নৌকো। মহর্ষি তখন সেই নৌকোয় বাস করতেন। নৌকোর মধ্যে ধ্যানমগ্ন মহর্ষিকে দেখে তাঁর খুব পছন্দ হলো। অনেকক্ষণ বাদে মহর্ষির ধ্যান ভাঙলো। চোখ চেয়ে তিনি সবিস্ময়ে দেখেন তাঁর সামনে বসে এক প্রিয় দর্শন যুবক। টানা-টানা ছুটি চোখের দৃষ্টিতে তার মনের কথা যেন ফুটে উঠেছে—কী যেন একটা ব্যাকুলতায় যুবকের সারা চিত্ত অস্থির।

পরিচয়ের পর মহর্ষি জিজ্ঞাসা করেন, আমার কাছে কি চাও?

—ভগবানকে দেখতে চাই। লোকে বলে আপনি নাকি ঈশ্বর দর্শন করেছেন। সত্যি?

—না, দেখিনি। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি একদিন নিশ্চয়ই ভগবানের সাক্ষাৎ পাবে—এই বলে মহর্ষি নরেনের মাথায় হাত

রাখলেন। তিনি শান্ত মনে গৃহে ফিরলেন। ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া-আসাটা বাড়ে। রামমোহনের বইগুলো পড়তে থাকেন। অবশেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের খাতায় তিনি নাম লেখালেন। যেদিন সমাজে প্রার্থনার পর নরেন্দ্রনাথ একখানা গান গাইলেন, সেদিন থেকে সমাজ-মন্দিরে লোকের ভীড় বাড়তে থাকে। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সুমধুর গান সকলের মনে আনন্দের স্রোত বইয়ে দিলো। সেই থেকে প্রতি রবিবার উপাসনার সময় নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ব্রহ্ম সংগীত একটা আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো।

ব্রাহ্মসমাজে তিনি নাম লেখালেন বটে, কিন্তু উপাসনা সম্পর্কে সমাজের অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারলেন না। অন্যের মতো নির্বিচারে কোনো কিছু গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়া, নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে কোনোদিনই ছিল না। দিন যায়। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় নরেন্দ্রনাথের মন তৃপ্তি পেল না, শান্তি পেল না। একটা জ্বলন্ত ধর্মবুদ্ধি তখন জেগেছে তাঁর মনের মধ্যে। তিনি দেখতে চান জীবন্ত সত্যকে। ঠিক এই সময়ে একদিন ক্লাসে ছাত্রদের ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়াতে পড়াতে হেস্টিসাহেব বললেন, প্রকৃতির সঙ্গে এই রকম একাত্মীয়তালাভ এই মনুষ্যজীবনেই সম্ভব, এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তোমাদের কেউ যদি দেখতে চাও তাহলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখে এসো। তিনি যেন প্রকৃতির সন্তান।

রামকৃষ্ণ পরমহংস।

নামটা শোনা মাত্র যেন গেঁথে যায় নরেনের মনে।

এর দু'দিন পরে শিমুলিয়ার সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে এসেছেন পরমহংসদেব। সুরেনবাবু তাঁর একজন গৃহী-ভক্ত। দত্তদের বাড়ির খুব কাছেই তাঁদের বাড়ি। বিশ্বনাথ দত্ত তাঁর বন্ধু। ঠাকুর গান শুনতে ভালোবাসেন। কিন্তু তেমন গায়ক কোথায় পাওয়া যায় এখন। একজন বললে, কেন, আমাদের নরেন তো খুব ভালো গান গায়, তাকে ডেকে পাঠালেই আসবে। তখনি সুরেনবাবু বন্ধুকে

অনুরোধ করে পাঠালেন নরেনকে একবার তাঁর বাড়িতে আসবার জন্য। বিশ্বনাথবাবু তখনি ছেলেকে পাঠিয়ে দেন সেখানে। কলকাতায় তাঁর যত গৃহী-ভক্ত ছিল তাদের সবাই এসেছেন সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে ঠাকুরকে দর্শন করতে, তাঁর শ্রীমুখের কথা শুনতে।

হেস্টিসাহেব এঁরই কথা তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকে সেদিন বলেছিলেন। তাঁকেই গান শোনাবার জন্য নরেনের ডাক পড়েছে। নরেন্দ্রনাথ এলেন তাঁর তানপুরাটি হাতে করে। রামকৃষ্ণ মাঝখানে বসে আছেন, ভক্তরা তাঁকে ঘিরে বসে আছে। তাদেরই মধ্যে ঠিক রামকৃষ্ণের মুখোমুখি এসে বসলেন নরেন্দ্রনাথ। সভা নিস্তব্ধ। নরেন গাইলেন ঃ

'মন চলো নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।'

দশ-পনেরো মিনিট ধরে গান চললো। গান শুনে রামকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন।

—ছেলেটা কে গা, শুধোলেন সর্বজ্ঞ ঠাকুর।

—দত্তবাড়ির ছেলে। কলেজে পড়ে। ওর বাবা এ্যাটর্নি, বললেন সুরেন বাবু।

ফিরবার সময় ঠাকুর বার বার করে নরেন্দ্রনাথকে বলে এলেন, একদিন যাস আমার ওখানে, কেমন ?

—কোথায় ?

—দক্ষিণেশ্বরে।

—যাব।

—ঠিক যাবি তো ? আমি তোর পথ চেয়ে বসে থাকব।

দেখতে দেখতে এফ. এ. পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকায় দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা নরেন্দ্র এক রকম ভুলেই গেলেন। যথা সময়ে পরীক্ষা হয়ে গেল। ভুবনেশ্বরী এইবার ছেলের বিয়ের জন্য

ব্যস্ত হলেন। কথাটা নরেনের কানে গেল। তিনি মা-কে বললেন, মা, আমি বিয়ে করব না।

—ও মা, পাগল ছেলে কি বলে ছ্যাখো।

—না, মা। আমি সত্যি বলছি বিয়ে করব মা। মনে নেই ছেলেবেলায় আমি প্রথমে রাম-সীতার ভক্ত ছিলাম, তারপর সর্বত্যাগী শিব হলেন আমার উপাস্য।

—ছেলেবেলার কথা এখন কি? হ্যাঁরে শিবঠাকুরের তো বৌ ছিল। এখন তুই বড়ো হয়েছিস, আমার কত সাধ তোর বিয়ে দিয়ে ঘরে একটা টুকটুকে বৌ আনব; কর্তা একটা সম্বন্ধও ঠিক করেছেন।

—না মা, আমি বিয়ে করব না।

কথাটা বিশ্বনাথ দত্তের কানে গেল। তিনি স্ত্রীকে বললেন, ওরকম কথা সব ছেলেই বলে থাকে। তুমি কিছু ভেবো না। বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হোক—তারপর বিয়েটা দিতে দেরী হবে না।

স্বামী-স্ত্রীতে সেদিন ঐ পর্যন্ত কথা হলো।

রাম দত্ত ছিলেন বিশ্বনাথ দত্তের দূর সম্পর্কের ভাই। রামকৃষ্ণের গৃহী-ভক্তদের মধ্যে তিনিও একজন। নরেন তাঁকে সেই সুবাদে 'কাকা' বলে ডাকতেন। এই সময়ে একদিন তিনি রাম দত্তের সঙ্গে দেখা করে বললেন, কাকা মনটা বড়ো অশান্ত হয়েছে, কি করি বলুন তো?

—যদি আমার কথা শুনিস তো বলি। ওসব ব্রাহ্মসমাজ-টমাজ ছেড়ে দে। দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে বল্, সব ঠিক হয়ে যাবে। যাবি, বল্?

—ও সেই তাঁর কথা বলছেন যাঁকে মিত্তির মশাইয়ের বাড়িতে একবার গান শুনিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনিই।

—তিনি তো আমাকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্যেও বলে গিয়েছিলেন।

—তবে তো কথাই নেই। যা তাহলে একদিন সেখানে।

—যাব, কালকেই যাবো আমি।

চার

দক্ষিণেশ্বরে এলেন নরেন্দ্রনাথ।

পরমহংসদেব তখন ভক্তদের নিয়ে ধর্মের কথা আলোচনা করছিলেন। ধর্মের কথা, মায়ের কথা ছাড়া অন্য কথা তিনি বড়ো একটা বলতেন না। নরেন্দ্র দেখলেন অতি সাধারণ একটি মানুষ। পরনে সরু কালো পাড়ের ধুতি, সে ধুতি আবার হাঁটু পর্যন্ত। ধুতির কোঁচার খোঁটটি কাঁধের ওপর। সামান্য একখানা তক্তপোষের ওপর বসে আছেন। পাশেই পানের একটা বটুয়া, তা থেকে পান বের করে মাঝে মাঝে পান খাচ্ছেন। মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। দেখলে ভক্তি হয়, কি শ্রদ্ধা জাগে এমন দরের চেহারা নয়, তবু, নরেনের মনে হলো, তাঁর মুখখানি যেন কী একটা দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাষিত আর কী এক দিব্য ভাবে ভরা তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি। নরেনের মনে জাগে বিস্ময়। বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতূহল হল। হাত তুলে প্রণাম করে বসলেন তিনি একপাশে চুপ করে।

নরেনকে দেখামাত্র রামকৃষ্ণের আনন্দ শতধারায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ও যেন তাঁর কতকালের চেনা, এমন ধারা ব্যবহার করেন নরেনের সঙ্গে।

—একটা গান গা, শুনি। সুরেনের বাড়িতে সেদিন যে গানটা গেয়েছিলি সেইটা গা, সবাই শুনবে।

নরেন গাইলেন। গান শেষ হলে তিনি নরেনের সব খবর জিজ্ঞাসা করেন। এফ. এ. পাশ করে, বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন, তাও তিনি জেনে নিলেন। তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন। আয় দেখি একবার আমার সঙ্গে।

এই বলে তিনি নরেনের হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন পাশের আরেকটা ঘরে। ভক্তরা তো অবাক। সেখানে কেউ নেই—শুধু রামকৃষ্ণ আর নরেন্দ্রনাথ। নরেনের হাত দুটি ধরে স্নেহ বিহ্বল কণ্ঠে রামকৃষ্ণ বলেন: তুই এতদিন আসিসনি কেন? কেমন করে ভুলে ছিলি? তুই আসবি বলে আমি কতদিন ধরে পথের দিকে চেয়ে আছি।

বলতে বলতে বুকের কাছে টেনে নিলেন তিনি নরেনকে। চোখ দুটি তাঁর জলে ভরে ওঠে। বলেন, মনের কথা বলার মানুষ পাইনে; যারা এখানে আসে তারা সব বিষয়ী—কেবল সংসারের কথা, টাকা-পয়সার কথা বলে আমার সঙ্গে। ওদের সঙ্গে কথা বলে আমার মুখ তেতো হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে তোর সঙ্গে—তোর মতো একজন সত্যিকারের ত্যাগীর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাব।

রামকৃষ্ণ চুপ করলেন।

নরেনের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই।

কে এই অদ্ভুত সাধু?—মনে মনে ভাবেন তিনি। কিন্তু কি বলবেন ভেবেই পেলেন না। হঠাৎ রামকৃষ্ণ একটা কাণ্ড করে বসলেন। হাত দুটি জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়েন আর নরেনকে লক্ষ্য করে বলেন, জানি তুমি কে। তুমি নর-দেহে নারায়ণ। দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্যেই তোমার আসা। তুমি এসেছ জীবের কল্যাণ কামনায়—আর বলতে পারেন না।

—সে কি মশাই? বেশ তো আজগুবি কথা বলছেন। আমি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন দত্ত।

—ওরে আমি জানি তুই কে।

রামকৃষ্ণ আর কিছু বললেন না। আবার তিনি ভক্তদের মধ্যে ফিরে এসে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

সেদিন ঐ পর্যন্ত। কলেজের উচ্চশিক্ষিত যুবক নরেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি এই দেব-মানবের চরিত্রের মর্ম বুঝতে গিয়ে বিষম ধাক্কা খেলো, আর একদিন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। এবার তিনি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, মশাই, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—কল্পনায় দেখা নয়, সত্যি-সত্যি দেখেছেন কিনা?

—সত্যি-সত্যি দেখেছি, এই তোকে যেমন আমার সামনে দেখছি।

—কথা বলেছেন ভগবানের সঙ্গে।

—বলেছি বৈকি। রোজই তো বলি।

এ পাগল পূজারী ব্রাহ্মণ বলে কি। নরেনের মন তাঁর দিকে একটু আকর্ষণ বোধ করলো। মন তাঁর একটুখানি টললো। তবু সম্পূর্ণভাবে তাঁকে স্বীকার করতে তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধিতে বাধলো। এখানে কলকাতার কত নাম করা লোকে আসেন, নরেন্দ্র দেখলেন। হয়ত মানুষটা পাগল নয়; কিছুটা সাঁচ্চা হতে পারে। তবু তিনি ঠিক করলেন, ভালো করে বাজিয়ে নিতে হবে। রাখাল ঘোষ নামে তাঁর এক পরিচিত বন্ধু ছিলেন। তিনিও ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়ে ছিলেন। তিনি নরেনের কিছু আগে থেকেই দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা শুরু করেছেন। নরেন একদিন তাঁর বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন, রাখাল, লোকটাকে তোর কি রকম মনে হয়, সত্যি বলবি?

—ঈশ্বরপ্রেমিক।

—তাহলে ঈশ্বরদর্শী নন?

—হ্যাঁ, তাও। ঈশ্বরকে দর্শন না করা পর্যন্ত কেউ কি সত্যি কারের ঈশ্বর প্রেমিক হয়।

—তুই বলছিস উনি ঈশ্বরকে দেখেছেন।

—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

—আচ্ছা রাখাল, তুই মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করিস? বিশ্বাস করিস যে দক্ষিণেশ্বরে ঐ ভবতারিণী জাগ্রত দেবী?

—হ্যাঁ করি। আমি তো ঐ প্রতিমাকে প্রণাম করি যখনই ওখানে যাই।

—তুই মিথ্যাচারী, রাখাল। তুই না ব্রাহ্মসমাজে যাস, তুই না 'একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করব' এই মর্মে সমাজের প্রতিজ্ঞা পত্রে সই করেছিস।

একদিন রামকৃষ্ণের সামনেই নরেন্দ্র রাখালকে আবার এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। রাখাল অপ্রতিভ হয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। রামকৃষ্ণ রাখালকে ঠিক তাঁর ছেলের মতো ভালোবাসতেন। তাই তিনি নরেনকে বললেন, ওর যদি সাকারে ভক্তি হয় তাহলে ও কি করবে? তোমার ভালো না লাগে তুমি কোর না।

সত্যি কথা বলতে নরেনের নিরাকার ধ্যানই ভালো লাগতো।

আবার একদিন রাম দত্তকে নরেন জিজ্ঞাসা করেন, কাকা, সত্যি করে বলুন তো, আপনার দক্ষিণেশ্বরের ঐ অদ্ভুত মানুষটির কি সত্যিই ঈশ্বর দর্শন হয়েছে?

—হ্যাঁরে হ্যাঁ। এই আমি তোর গা ছুঁয়ে বলছি।

এইভাবে নরেন আসা-যাওয়া করেন। সংশয় কিছুটা দূর হয়েছে, কিছুটা রয়ে গেছে। অন্তর থেকে কে যেন তাঁকে বলে, তোমার ইহজীবনের যা কিছু সাধনা ও সিদ্ধি, জেনো, সব ঐ দক্ষিণেশ্বরের মানুষটির পায়ের তলায়। দিন যায়। নরেন্দ্রনাথ কেবলই অনুভব করতে থাকেন রামকৃষ্ণের প্রেমের আকর্ষণ। গভীর ও নিখাদ সেই প্রেম। তাঁর সকল কাজ, সকল চিন্তার মধ্যে ঘুরে ফিরে ভেসে ওঠে তাঁরই প্রেমময় মূর্তি।

একমাস পরে একদিনের কথা।

নরেন এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সেদিন এসে দেখেন কেউ কোথাও নেই, রামকৃষ্ণ একা তাঁর ছোট বিছানাটির ওপর বসে আছেন। নরেনকে দেখে ভারি খুশি। তাঁকে আদর করে বসালেন নিজের পাশেই। পর মুহূর্তেই ঘটলো একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন মহাপুরুষ আর সেই অবস্থায় তিনি ধীরে ধীরে তাঁর ডান পাটি রাখলেন নরেনের বুকের ওপর। পলকে প্রলয় ঘটে গেল। সেদিনকার সেই বিচিত্র ঘটনাটির বিষয় বিবেকানন্দ তাঁর নিজের মুখে এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

'অমনি আমার ভেতরে একটা অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে থেকে দৃশ্য জগৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরে দেয়াল নেই, আসবাব-পত্র কিছু নেই—কোনো দৃশ্য পদার্থই দৃষ্টিপথে দেখা যায় না। একটা অসীম শূন্যতা আমার চারিদিকে বিরাজ করতে লাগল। নিজেকে হারাবার উপক্রম হলো। আমি ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, ওগো, তুমি আমার একী করলে? আমার যে বাপ-মা ভাই-বোন আছে। ঠাকুর হেসে আমার বুকে হাত রাখলেন; সঙ্গে সঙ্গে আমি ফিরে পেলাম আগের অবস্থা। দৃশ্য জগৎ আবার ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠলো। এই ঘটনায় আমার মনে এক গভীর সমস্যার উদয় হলো। এই কী সমাধির অনুভূতি, না দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলের বশীকরণ বিদ্যা? আমার বিচার-বুদ্ধি দিয়ে কোনো কূল-কিনারা পেলাম না এর।

তিন বছর পরের কথা।

নরেন্দ্র যথা সময়ে বি. এ. পাশ করলেন।

স্বভাব কিন্তু সেই আগের মতো—ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করেন, বড়ো বড়ো ব্রাহ্মদের সঙ্গ করেন, আবার মাঝেমাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পরমহংসদেবকেও দর্শন করে আসেন। যাকে বলে দোদুল্যমান অবস্থা, নরেনের মনের ভাবটা তখন ঠিক এই রকম

হয়ে উঠেছিল। কোথাও যেন স্থির ভূমি পাচ্ছেন না। একদিন ব্রাহ্মসমাজের তরুণ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে ডেকে বললেন, শুনলাম তুমি নাকি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা কর? শোনো, একটা কথা বলি তোমাকে। ওসব সমাধি, ভাবটাব যা দেখেছ ওখানে, ওসব ভূয়ো, স্নায়ু দুর্বল হলে এই রকম ব্যাপার হয়। আসলে পরমহংসদেবের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি আর ওখানে যেও না।

নরেন্দ্র নিরুত্তর রইলেন।

তাঁর অন্তরে যেন ঝড় উঠলো।

সংশয় আর অবিশ্বাসে আলোড়িত হয় তাঁর চিত্ত।

সেদিন সারা রাত তাঁর ঘুম হলো না। বিনিদ্র চক্ষে কত কথাই না ভাবতে লাগলেন। সকাল হলো। কাউকে কিছু না বলে তিনি চললেন দক্ষিণেশ্বরের পথে। এসে দেখেন ভক্তরা ঘিরে বসে আছেন পরমহংসদেবকে। তাঁদের সঙ্গে তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করছেন —আলোচনা করছেন ধর্মের বিষয়। কী সহজ ভাবেই না তিনি এমন কঠিন বিষয়ের আলোচনা করছেন। ঘরের পরিবেশ যেন একটা দিব্য ভাবে পূর্ণ। নরেন্দ্রর মনটা বেশ হাল্কা হলো।

আর একদিনের কথা।

মাঝখানে নরেন্দ্রনাথ অনেকদিন যেতে পারেননি দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ খুব ব্যাকুল হলেন তাঁকে দেখবার জন্য। ভাবলেন সমাজে গেলে নরেনকে দেখতে পাবেন। সেদিন রবিবার। সমাজে উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। ঘর-ভর্তি লোক। বেদী থেকে আচার্য বক্তৃতা করছেন। ঈশ্বরীয় আলোচনা শুনে রামকৃষ্ণ ভাবসাগরে ডুবে গেলেন অমনি। সেই অবস্থায় তিনি এগিয়ে এলেন বেদীর কাছে। চলেছেন ঠিক যেন কলের পুতুল—কোনো হুঁস নেই, বাহ্য জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে। মাটিতে পড়ে যান আর কি। সভায় তুমুল চঞ্চল্য দেখা দিল। ব্রহ্মজ্ঞানীরা ভাব সমাধি বুঝত না, তাই তারা বিরক্ত

হয়ে উঠলো রামকৃষ্ণের সেই অবস্থা দেখে। কেউ ভদ্রতা করে তাঁকে সম্ভাষণ পর্যন্ত করল না, শিষ্টাচার দেখানো তো দূরের কথা। নরেন্দ্র দেখলেন এই দৃশ্য। ব্রাহ্মদের ওপর ক্রুদ্ধ হলেন তিনি মনে মনে। রামকৃষ্ণের সমাধি-মগ্ন দেহখানি সযত্নে ধরে তাঁকে বাইরে নিয়ে আসেন। তাঁর প্রতি ব্রহ্মদের এই ব্যবহারে তিনি গভীর আঘাত পেলেন। সেইদিন থেকে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া ত্যাগ করলেন চিরদিনের মতো।

বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গেলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন সবে বি. এ. পাশ করেছেন। পিতার মৃত্যুকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন না—বরানগরে গিয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানেই তিনি এই দুঃসংবাদ পেলেন। পিতার মৃত্যুতে যুবক নরেন্দ্র যেন পৃথিবী অন্ধকার দেখলেন। আইন-ব্যবসায়ে যথেষ্ট উপার্জন করলেও, উদার ও দানে মুক্তহস্ত ছিলেন বলে বিশ্বনাথ দত্ত ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে যেতে পারেন নি। মাসে হাজার টাকা খরচ হতো যে সংসারে, সেই সংসারে তখন দেখা দিল নিদারুণ অভাব। সংসারের কথা নরেন্দ্রনাথকে এতদিন চিন্তা করতে হয়নি, আজ তাই দারিদ্র্যের কঠিন স্পর্শে তিনি যেন চমকে উঠলেন।

সম্মুখে কঠিন জীবন-সংগ্রাম।

বিধবা মা, এতগুলি ভাই-বোন এদের মুখের অন্ন জোগাতে তাঁকে নামতে হবে জীবন-সংগ্রামে। বাড়ির বড়ো ছেলে তিনি—বড়ো এবং উপযুক্ত। নরেন্দ্রনাথের মন থেকে তখন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সব মুছে গেল। সংসারের দায়িত্ব বহন করবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। জীবন-সংগ্রাম যে কি কঠিন, তা এতদিন প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে তিনি বুঝবার অবকাশ পাননি। এখন বুঝলেন। তাই এক দিকে তিনি আইন পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হন, অন্যদিকে কাজকর্মের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু কোনো সুবিধাই করে

উঠতে পারেন না। কোথায় তিনি ঠিক করেছিলেন বিলেত গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবেন, বিশ্বনাথের ইচ্ছা ছিল ছেলেকে ব্যারিস্টার করবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য। এইতো পৃথিবীর নিয়ম। নরেন্দ্রনাথই কি ভেবেছিলেন যে তাঁকে অত অল্প বয়সে নামতে হবে জীবন-সংগ্রামে।

কিন্তু কি কঠিন এই জীবন-সংগ্রাম।

আর কি মর্মন্তুদ এই ভাগ্যের পরিহাস।

যে বিশ্বনাথ দত্তের দানে কত লোক উপকৃত হয়েছে, প্রতিপালিত হয়েছে কত আত্মীয়-স্বজন, আজ তাঁরই ছেলেকে দাঁড়াতে হলো অন্যের কাছে হাত পেতে। মুখে সহানুভূতি জানালো অনেকেই, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এমন একজনকে পেলেন না যার ওপর তিনি ভরসা করতে পারেন এই দুর্দিনে। বিপদ কখনো এক আসে না। নরেন্দ্রনাথ যখন জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যস্ত তখন আর একটা বিপদ দেখা দিল। তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেরই হিংসা ছিল বিশ্বনাথ দত্তের ঐশ্বর্যের ওপর। যেই তিনি মারা গেলেন অমনি তাঁর ছেলেমেয়েদের বাস্তুচ্যুত করবার জন্য একজন আত্মীয় এক মামলা জুড়ে দিলেন।

বিষম বিপদে পড়লেন নরেন্দ্রনাথ।

মোকদ্দমা লড়তে গেলে টাকার দরকার। সে টাকা তাঁর কোথায়! হঠাৎ মনে পড়লো নিমাই বসুর কথা। তিনিও আইনজীবী এবং বিশ্বনাথ দত্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু। নরেন একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি নরেনকে আশ্বস্ত করে বললেন, আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের গায়ে কেউ আচড়টি দিতে পারবে না। নিমাইবাবুর চেষ্টায় তিনি এই মামলার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

দিন যায়। সংসারের কঠিন মূর্তির সঙ্গে ভাগ্যহীন যুবকের পরিচয় আরো নিবিড় হয়। অন্য কেউ হলে এমন অবস্থায় স্থির থাকতে পারত না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের চরিত্র অন্য উপাদানে তৈরি ছিল। তিনি ভেঙে পড়লেন না। দেখতে দেখতে পিতার মৃত্যুর পর কয়েক

মাস কেটে গেল। চাকরির কোনো সুবিধা কোথাও হলো না। ওদিকে সংসারে অন্নাভাব তীব্র হয়ে ওঠে। কোনো কোনো দিন পরিবারবর্গের আহারের জন্য কিছুই জোটে না। বাইরে কতদিন ক্ষুধার জ্বালায় নরেন্দ্র রাস্তার কল থেকে অঞ্জলি ভরে জল পান করে ক্ষুধা নিবারণ করতেন। উপবাসে তাঁর সেই বলিষ্ঠ শরীর শীর্ণ হয়ে যায়। যদি কেউ সাহায্য করতে আসত, নিতেন না। এমনি প্রখর ছিল তাঁর আত্মসম্মান বোধ। ক্ষুধার জ্বালায় কারো কাছে তিনি হাত পেতে সাহায্য নেবেন, এমন চিন্তাও তাঁর কাছে অসহ্য ছিল।

আমাদের দিন কি এইভাবে যাবে?

ভগবান কি আমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইবেন না?

সব সময় নরেন্দ্র ভাবতেন এই সব কথা। দারিদ্র্যে ও অভাবে ভুবনেশ্বরী দেবীর মন এতদূর পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল যে একদিন সকালে নরেন্দ্রনাথ যখন ভগবানের নাম মুখে নিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন, তখন সেই কথা কানে যেতেই মা ধমক দিয়ে ওঠেন—ভগবান! ভগবান তো সব করলেন।

নরেন নির্বাক। দারিদ্র্য কি ভীষণ জিনিস, বুঝলেন তিনি। অমন ভক্তিমতী যে তাঁর মা, তাঁর মন পর্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠেছে আজ অভাবের তাড়নায়। এমন সময়ে তিনি একদিন খবর পেলেন যে রামকৃষ্ণ কলকাতায় এসেছেন এক ভক্তের বাড়িতে। নরেন গেলেন তাঁকে দেখতে। কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসলেন। রামকৃষ্ণ বললেন, কতদিন যাসনি ওখানে। কাল আসিস।

কথায় স্নেহ ঝরে। সে স্নেহ স্পর্শ করে ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবকের হৃদয়। মন তাঁর শান্ত হয়। পরের দিন এলেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর জীবনতীর্থ দক্ষিণেশ্বর। পরমহংসদেব বসে আছেন স্থির হয়ে, চোখ বুঁজে। দুই চোখ দিয়ে ঝরছে করুণার পূতধারা। সেদিন নরেন আর বাড়ি ফিরলেন না। রাতটা ওখানেই কাটালেন। রাতের নির্জন প্রহরে তাঁর ইস্টদেব তাঁকে নানা রকম সান্ত্বনা ও উপদেশ

দিলেন। সেই রাতে ভাবাবিষ্ট চিত্তে রামকৃষ্ণ সর্ব প্রথম নরেন্দ্রকে বললেন, মনে রাখিস আর পাঁচ জনের মতো জীবন যাপন করবার জন্য তোর জন্ম হয়নি। তোর জীবনের উদ্দেশ্য মহান্। মা তোকে দিয়ে অনেক কাজ করাবেন।

বিশ্বাস করলেন কি না করলেন, এই কথা শুনে নরেনের মন সে দিন একটা অভূতপূর্ব আনন্দে ভরে উঠলো। একটা নতুন চেতনা নিয়ে তিনি ফিরলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে। আর উৎসাহ নেই তাঁর কাজ-কর্ম খোঁজার জন্য। কেমন যেন একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরতা এসেছে তাঁর জীবনে সেই দারুণ দুঃখের মধ্যে। সাংসারিক ব্যাপারে ছেলেকে অমন নির্লিপ্ত নিরাসক্ত দেখে মা একদিন বললেন, এতই যদি তোর বিশ্বাস, তাহলে তোর ঠাকুর কি ইচ্ছে করলে তোর এই দারিদ্র্য দূর করতে পারেন না?

কথাটি নরেনের মনে বড়ো লাগল।

সেই দিনই তিনি এলেন দক্ষিণেশ্বরে। স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করলেন। আপনি বলেন মা আপনার কথা শোনেন। আমাকে যদি সত্যিই ভালোবাসেন, তাহলে আপনার মাকে বলুন না যাতে আমাদের দারিদ্র্য ঘোচে।

—ওরে, তোকে আমি ভালোবাসি। তাতে কি সন্দেহ আছে রে! মা-কে যদি বলি, তিনি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনবেন। তবে কি জানিস, আমি যে কোনোদিন মার কাছে টাকা-পয়সা কিছু চাইতে পারি নি।

—তাহলে আমাদের অভাব ঘুচবে না?

—তুই নিজে একবার চেয়ে নে।

—আমি বললে মা শুনবেন?

—হ্যাঁরে, হ্যাঁ। খুব শুনবেন। তুই একবার চেয়ে ছাখ না।

এক শুভদিন দেখে নরেন্দ্রনাথ এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সোজা চলে আসেন ভবতারিণীর মন্দিরে। মায়ের রূপ দেখে তাঁর মন ভরে যায়। সংসারের অভাবের কথা জানাতে ভুলে যান। কিছুতেই তাঁর মুখ থেকে টাকা পয়সা চাইবার কথা বেরুল না। ফিরে আসেন। গঙ্গার ধারে পায়চারি করেন। কখনো মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের মুখ, আবার পরমুহূর্তে ভেসে ওঠে দক্ষিণেশ্বরের এই মায়ের রূপ। ভুবনেশ্বরী আর ভবতারিণী এই দুটি মুখ পাল্টাপাল্টি করে ভেসে উঠতে থাকে নরেনের মনের পটে। আবার ফিরে আসেন মন্দিরে। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে দারিদ্র্যক্লিষ্ট যুবকের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় এই প্রার্থনা ঃ মা, আমায় ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, বিশ্বাস দাও—দাও আমাকে বিবেক আর বৈরাগ্য।

অভাবের কথা জানাতে পারলেন না। তারপর ফিরে এলেন রামকৃষ্ণের কাছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে মার কাছে চাইলি কিছু ?

—না, কিছু চাইতে পারলাম না।

—আবার যা। মা'র কাছে গিয়ে বলগে সব কথা।

নরেন আবার আসেন মন্দিরে। রামকৃষ্ণ বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভাগ্যতাড়িত যুবক এবারও ঐ কথা বললেন। টাকা-পয়সার বদলে চাইলেন জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, আর বিবেক ও বৈরাগ্য।

আড়াল থেকে নরেনের প্রার্থনা শুনে উল্লসিত হয়ে রামকৃষ্ণ ফিরে তাঁর ঘরটিতে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ এলেন সেখানে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন রামকৃষ্ণ, কিরে চাইলি মা'র কাছে।

—না, টাকা পয়সা চাইতে পারলাম না।

—আবার যা। বার বার তিনবার।

আবার নরেন আসেন মন্দিরে। আবার তাঁর মুখ দিয়ে সেই একই কথা বেরুলো। তখন তিনি বুঝলেন এ পরমহংসদেবের পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। নইলে তিনি যা বলতে চান মা'র কাছে তা বলতে

পারেন না কেন ? বিষয়ের কথা জানাতে গিয়ে বৈরাগ্যের কথা আসে কেন তাঁর মুখে ?

শিষ্যের পরীক্ষা শেষ হলো।

পরীক্ষা তো নয়—একেবারে অগ্নি-পরীক্ষা।

যেন নরেন্দ্রনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরে রামকৃষ্ণ বলেন। ওরে তোর ভয় নেই। আজ থেকে তোদের সংসারে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হবে না কিন্তু তোর কপালে সংসার সুখ নেই।

ঘুচে যায় দারিদ্র্য। ঘুচে যায় সকল সংশয়।

এইবার আত্মনিবেদন করলেন নরেন্দ্রনাথ তাঁর ইষ্টদেবের পাদপদ্মে।

রামকৃষ্ণ দীক্ষা দিলেন তাঁর মানস-সন্তানকে। দীক্ষা শেষ হলে পরে বললেন : তুমি নররূপী নারায়ণ। জগৎ উদ্ধারে অবতীর্ণ হয়েছ আমারই লীলা সহচর হিসাবে।

পাঁচ

রামকৃষ্ণের চরণে সঁপে দিলেন নরেন্দ্রনাথ নিজেকে।

মানসপুত্রকে ধীরে ধীরে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন রামকৃষ্ণ।

একা নরেন নয়, একে একে তাঁর লীলাসহচরগণ আসতে থাকেন —এলেন তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানগণ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, সারদানন্দ, প্রেমানন্দ এবং আরো অনেকেই। ঈশ্বরে নিবেদিত-প্রাণ এইসব ছেলেদের জন্যেই বুঝি একদিন অপেক্ষা করছিলেন রামকৃষ্ণ। তারপর কঠোর সাধনার ফলে এঁরা সবাই এগিয়ে চলেন আধ্যাত্মিক পথে। বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার, পাণ্ডিত্যের অভিমান সব কিছু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় এদের অন্তর থেকে। এঁরা সবাই রামকৃষ্ণের সন্তান—এঁরাই একদিন রামকৃষ্ণ-নামের পতাকা কাঁধে তুলে নিয়ে নামবেন পৃথিবীর পথে তাঁরই বাণী প্রচার করতে। সংসার, সংসার-সুখ এঁদের জন্য নয়। এঁদের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষে আসবে একটা নবযুগ—এই ধারণা আজ এঁদের প্রত্যেকের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছে।

১৮৮৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে রামকৃষ্ণের অসুখ করলো। নরেন, রাখাল, তারক, শরৎ, শশী, কালী প্রভৃতি তাঁর যুবক শিষ্যরা প্রাণ দিয়ে

সেবা করেন। দক্ষিণেশ্বরে অসুখ বাড়লো। সেখান থেকে তাঁকে প্রথমে নিয়ে আসা হলো কলকাতায় শ্যামপুকুরে, তারপর সেখান থেকে কাশীপুরে একটা বাগানবাড়িতে। গুরুসেবায় মন প্রাণ ঢেলে দেন তরুণ শিষ্যরা। ওষুধপত্র, চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা—কিছুরই ত্রুটি নেই। কিন্তু অসুখ ক্রমেই বেড়ে চললো। নিজের শক্তি তাঁর সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে, রামকৃষ্ণদেব যে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করবার আয়োজন করছেন, কেউ তা বুঝতে পারেন নি। লীলাসংবরণ করার আগে একদিন একটা কাগজ চেয়ে লিখলেন, 'নরেন শিক্ষে দেবে। আর একদিন বারোখানা কাপড় গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে আনালেন ; তারপর সেগুলি ছেলেদের প্রত্যেককে দিয়ে বললেন, আজ থেকে তোরা সন্ন্যাসী হলি। ঠাকুর নিজের হাতে গেরুয়া বস্ত্র দিলেন, শিষ্যরা কৃতার্থ বোধ করলো। সব শেষে একদিন তাঁর প্রিয়তম মানস পুত্র নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডেকে ঠাকুর বললেন, আমার সাধনা ও সিদ্ধি আজ তোকে দিয়ে আমি ফকির হলাম।

—কিন্তু আমি চাই নির্বিকল্প সমাধি।

—তাও লাভ হবে তোর। তবে এখন নয়, পরে।

—এখন আমায় কি করতে হবে ?

—বহুজনের হিতের জন্য তোকে কাজ করতে হবে।

—অসম্ভব। অত শক্তি পাব কোথায় ?

—সেই অসাধ্য সাধনের শক্তি তোকে আমি দিয়ে গেলাম।

এমনি করেই ঠাকুর তাঁর মানস-সন্তানকে লোকগুরুর পদে অভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন।

১৮৮৬, ১৬ই অগস্ট, রবিবার।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেহত্যাগ করলেন।

দক্ষিণেশ্বরের সূর্য অস্তমিত হলেন।

বরাহনগর।

রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের ক'দিন পরেই একটি তামার কলসীতে ভরে তাঁর পবিত্র দেহভস্ম মাথায় নিয়ে নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ শিষ্যগণ কাশীপুর বাগানবাড়ি থেকে উঠে এলেন বরাহনগরের একটা জীর্ণ বাড়িতে। রামকৃষ্ণভক্ত সুরেন মিত্তির এই বাড়িটা তাঁদের দিয়েছিলেন থাকবার জন্য। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভাবী সন্ন্যাসী তরুণ যুবকগণ সেইখানে কোন মতে মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে নিয়েছে। ঠাকুরের ভোগের অন্ন কোন মতে জুটে যায়। নিজেদের আহার মানকচু সিদ্ধ আর মোটা চালের ভাত; তাও কোনো দিন দু'বেলা জোটে না। শাস্ত্র আলোচনা, ধ্যান-জপ, সাধন ভজন, কীর্তন চলে দিনরাত। সকলেই দিব্যভাবে বিভোর। ঠাকুর জানতেন এরা আর ঘরে ফিরবে না, তাই তো তিনি বলে গিয়েছেন, নরেন এদের দেখবে।

'বিশ্ব জগতে তোকে অনেক কাজ করতে হবে।'

গুরু এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সতীর্থদেরও পরিচালনার ভার তাকেই দিয়ে গেছেন। নেতা নরেন্দ্রনাথের এখন অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। তিনিই এখন সকলের আশা-ভরসার স্থল। রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে যে বিপুল সঙ্ঘ গড়ে উঠবে তারই সূচনা হয়েছিল এই বরাহনগরের মঠে। অনেক দুঃখ, অনেক অভাব, আর অনেক কষ্টের ভেতর দিয়ে দিনগুলি কাটে এখানে। বিশ্রাম নেই, আলস্য নেই, সব সময়ে গুরুভাইদের উৎসাহ দিয়ে এই সময় নরেন্দ্র কতদিন তাঁদের বলতেন, জয় রামকৃষ্ণ! মানুষ গড়াই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হোক। মনে রেখো এই আমাদের সাধনা।

দিন যায়। বরাহনগর মঠে ঈশ্বর-আলোচনা আর ধর্ম চিন্তা নিয়ে দিন কাটে রামকৃষ্ণ-সন্তানদের। দিনরাত পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ, শাস্ত্রপাঠ—এই সবের মধ্যে তাঁরা তন্ময় হয়ে থাকতেন সর্বক্ষণ। এ এক বিচিত্র জীবন, বিচিত্র অনুভূতি। মাঝে মাঝে অভিভাবকেরা আসেন এঁদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। এগিয়ে আসেন

নরেন্দ্রনাথ তাঁদের বাধা দিতে। তাঁদের সঙ্গে জোর গলায় তর্ক করেন তিনি। বলেন আমরা সবাই রামকৃষ্ণের সন্তান ; আমাদের আদর্শ সন্ন্যাসীর পবিত্র জীবনযাপন। মহাসমন্বয়ের বার্তা আমরা প্রচার করব। আমরা রামকৃষ্ণের পতাকাবাহী সন্তান-সঙ্ঘ। 'বহুজন হিতায়'— এই মন্ত্রে সার্থক হবে আমাদের জীবন।

কী জ্বলন্ত বিশ্বাস!

তরুণ সন্ন্যাসীর ললাটে উদ্ভাসিত কী অপূর্ব মহিমার জ্যোতি। অভিভাবকগণ ফিরে যান ব্যর্থ মনোরথ হয়ে। বরাহনগরের এক জীর্ণ বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ কিভাবে তাঁর গুরুভাইদের নিয়ে একটা নবযুগের সূচনা করেছিলেন সেই ইতিহাসই তো তাঁর জীবনের প্রকৃত ইতিহাস।

১৮৮৮।

বরাহনগরের মঠ থেকে তীর্থ-ভ্রমণে বেরুলেন নরেন্দ্রনাথ।

এখন থেকে প্রায় পাঁচটি বছর তাঁকে আমরা দেখতে পাই পরিব্রাজকরূপে। সারা ভারতবর্ষই তিনি একরকম কর্পদকশূন্য অবস্থায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। অদ্ভুত সেই জীবন। এখন আর তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত নন—স্বামী বিবেকানন্দ এই নামের মধ্যেই নবজন্ম হয়েছিল তাঁর। এই নামেই তিনি পরিচিত হলেন ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে—সারা বিশ্বের নরনারীর সঙ্গে।

চীর গৈরিকধারী তরুণ সন্ন্যাসী একা চলেছেন ভারতের পথে পথে। তাঁর সেই মহিমাব্যঞ্জক মূর্তি, সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, তপোজ্জ্বল প্রশান্ত বদন, আয়তচক্ষু সকলেরই মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। প্রথমে তিনি এলেন শিবধাম কাশীতে। অসংখ্য মঠ ও মন্দিরে সুশোভিত পুণ্য বারাণসী তীর্থ দর্শন করে তাঁর মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কাশীর পাশ দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে বয়ে চলেছে কলুষনাশিনী গঙ্গা। গঙ্গার তীরে কত ঘাট প্রত্যেকটি ঘাটে পাথরের সিঁড়ি। সাধুকণ্ঠের স্তবস্তুতি ও পূজা-আরাধনায় সর্বদা মুখরিত কাশীর ঘাট। রামকৃষ্ণদেব একবার এসেছিলেন এখানে। সেই স্মৃতি জেগে ওঠে তাঁর শিষ্যের

মনে। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির পবিত্র ধ্বনি। কাশীতে এসে তিনি একদিন গঙ্গার তীরে এখানকার সচল মহাদেব ত্রৈলঙ্গস্বামীর দর্শনলাভ করে ধন্য হলেন।

কাশীতে তখন আরেক জন বিখ্যাত জ্ঞানী ও সন্ন্যাসী বাস করতেন। নাম—স্বামী ভাস্করানন্দ। একদিন কথায় কথায় তিনি বিবেকানন্দকে বলেন, এই পৃথিবীতে কেহই পুরোপুরি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে না। প্রতিবাদ করলেন তিনি এই কথার। বললেন, বলেন কি সাধুজী? আমি অন্তত একজনকে জানি, যিনি কাম-কাঞ্চনের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পেরেছিলেন।

—কে তিনি?

—তিনি এই অধমের ইষ্টদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

দশাশ্বমেধ ঘাটে নিত্য গঙ্গাস্নান ও জপ করতেন। কখনো মন্দিরে এসে ঘন্টার পর ঘণ্টা ধ্যানে তন্ময় হতেন। সাধুদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। কাশীর কাছেই সারনাথ। সেখানে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গেলেন স্বামীজি। যতদিন কাশীতে ছিলেন তিনি মাধুকরী ও ভিক্ষায় ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করতেন; কখনো বা ছত্রম থেকে বিশ্বনাথের প্রসাদ খেতেন। সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বনাথের আরতি দেখতে গিয়ে নিশ্চল পাষাণের মতো চেয়ে থাকতেন নিমেষ-হীন দৃষ্টি নিয়ে। মন্দিরে মন্দিরে শুধু বিগ্রহ দেখতেন না, সেই সঙ্গে খুব মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতেন তার ভাস্কর্য। এই কাশীতে আরেক জন বিখ্যাত বাঙালীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। ইনি বিশিষ্ট লেখক ও মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

কাশী থেকে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন বরাহনগরের মঠে। ফিরে এসে গুরুভাইদের বললেন, ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ড কাশীধাম ঘুরে এলাম। এখন আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, এবার আমাদের প্রচার কার্যে নামতে হবে। কিন্তু তার আগে দেশটাকে আরো ভালো করে দেখতে হবে আমাদের। বুঝতে হবে এই দেশের লক্ষ কোটি

মানুষের জীবনে আজ জমে উঠেছে কত বেদনা ; জানতে হবে এদের অভাবের করুণ ইতিহাস। যাও তোমরা সবাই বেরিয়ে পড়ো গুরুর নাম সম্বল করে। মনে রেখো, ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণব্রতের সাধনাই আমাদের প্রকৃত সাধনা—মোক্ষ নয়, মুক্তি নয়।

সকলের অন্তর স্পর্শ করলো স্বামীজির এই সুন্দর কথাগুলি। গুরুভাইরা সবাই এক মন, এক প্রাণ। তাঁদের নেতা বিবেকানন্দ। এই নবীন সন্ন্যাসী-দল তাঁদের নেতাকে সামনে রেখে নামলেন লোকসেবার কাজে। ভারত-পরিক্রমায় তাঁদের প্রায় সকলেই বেরিয়ে পড়েন একে একে। বিবেকানন্দও আবার বেরুলেন। এলেন কাশী। এখান থেকেই শুরু হয় পরিব্রাজকের ভারত পরিক্রমা। দণ্ড আর কমণ্ডলু হাতে নিয়ে উত্তর ভারতের নানা স্থান হয়ে তিনি এলেন রামসীতার স্মৃতিপূত অযোধ্যায়। মনে পড়লো ছেলেবেলায় তিনি রামসীতার মূর্তি নিয়ে পূজো করতেন খেলার ভেতর দিয়ে। তারপর লক্ষ্ণৌ আগ্রা হয়ে পায়ে হেঁটে তিনি এলেন শ্রীকৃষ্ণলীলার স্মৃতিবিজড়িত শ্রীবৃন্দাবন ধামে। বৃন্দাবনের পথে একটি ঘটনা।

কলেজে পড়তেই স্বামীজি তামাক ধরেছিলেন। আগ্রা থেকে একটানা ত্রিশ মাইল পথ হেঁটে ক্লান্তি বোধ করলেন তিনি। এসময় একটু তামাক পেলে মন্দ হতো না। ভাবলেন তিনি। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে পথের একপাশে। সেখানে একমনে চোখবুঁজে একজন লোক তামাক খাচ্ছিল। লোকটির কাছে এসে স্বামীজি বলেন, ভাই, এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পারো? চোখ মেলে লোকটি তাকিয়ে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসী। সে একটু সংকোচ বোধ করে। বলে ম্যয় ভাঙ্গী হুঁ—আমি মেথর। হুঁকোটা ধরবার জন্য স্বামীজি হাতটা একটু বাড়িয়ে দিলেন ; কিন্তু 'মেথর' কথাটি শুনেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন, হাত গুটিয়ে নিলেন।

মেথর যে ছোট জাত, অস্পৃশ্য। এর ছোঁওয়া তামাক তো চলবে না। এগিয়ে চলেন তিনি। দু'পা যেতেই বিবেকানন্দের চমক ভাঙে।

আমি না শিখাসূত্র নামপত্র সব ত্যাগ করে, জাতিকুলের অভিমান বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছি—তবে কেন এই মেথরের হাত থেকে তামাক খেতে ইতস্তত করলাম ? এ কী আত্মপ্রবঞ্চনা। এ কী জাতি অভিমান ! বৃথা আমার এই সন্ন্যাস ! এই অনুশোচনার পর তিনি ফিরলেন। মেথরের কাছে এসে বসলেন, দাও ভাই, তোমার ঐ হুঁকোটা দাও। মনের আনন্দে মেথরের সাজা তামাক খেলেন তিনি। এমনি ভাবে এক অস্পৃশ্য এঁটো হুঁকো টেনে তিনি কতকাল আগে হরিজন আন্দোলনের সূচনা করে গেছেন।

গাজিপুর।

এখানকার বিখ্যাত সাধু পওহারী বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শুনেছিলে এই পওহারী বাবা যোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। যোগ শিখবার খুব ইচ্ছা হলো তাঁর। বাবাজী রাজী হলেন। গভীর রাতে তাঁর কাছে যাবার জন্য স্বামীজি প্রস্তুত হলেন, অমনি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন জ্যোতির্ময় একটি মূর্তি। রোমাঞ্চিত কলেবরে বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই ইষ্টদেব রামকৃষ্ণ। পওহারি বাবার কাছে তিনি আর গেলেন না।

এরপর হিমালয়ের নীচে হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি তিনি দর্শন করলেন। হৃষীকেশের স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। এখানকার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে তাঁর 'পরিব্রাজক' বইতে। স্বামীজি লিখছেন ঃ হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে ? 'সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায় ; সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল গঙ্গা বারি মনোহারি আর সেই অদ্ভুত হর্ হর্ হর্ ধ্বনি, সামনে গিরি নির্ঝরের হর্ হর্ প্রতিধ্বনি ?'

এখান থেকে এলেন আলওয়ার। একটি দেশীয় রাজ্য। আলওয়ারের মহারাজা মঙ্গল সিং বাহাদুরের আতিথ্য গ্রহণ করলেন তিনি। দিব্যকান্তি এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে মহারাজা

এতদূর মুগ্ধ হলেন যে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। আলওয়ার থেকে জয়পুর। উত্তর-পশ্চিম ভারত ভ্রমণ শেষ করে বিবেকানন্দ অবশেষে এলেন দক্ষিণ ভারতে।

তাঁর পরিব্রাজক জীবনের একটি কাহিনী বলি। পুরুষ-সিংহ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। একবার তিনি ট্রেনে করে চলেছেন রাজপুতানার ভেতর দিয়ে। তিনি যে কামরায় ছিলেন সেই কামরাতে ছ'জন ইংরেজ ছিল। তারা স্বামীজিকে একজন নিরক্ষর সাধু মনে করে নিজেদের মধ্যে নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসাহাসি করছিল। কিছুদূর গিয়ে ট্রেন একটা স্টেশনে থামল। স্বামীজি স্টেশন-মাস্টারের কাছে ইংরেজিতে এক গ্লাস খাবার জল চাইলেন। সাহেব ছুটো যখন দেখলে যে সাধুটি ইংরেজি জানেন এবং তারা নিজেদের মধ্যে এতক্ষণ যা বলাবলি করছিল সব বুঝতে পেরেছেন তখন একটু অপ্রতিভ হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো। আপনি আমাদের কথা বুঝতে পেরেও রাগ প্রকাশ করলেন না কেন?

বিবেকানন্দ একটু হাসলেন এই কথা শুনে। তারপর উত্তর করলেন : 'বন্ধুগণ, মূর্খলোকের সংসর্গে আসা আমার জীবনে এই প্রথম নয়। আমি ঢের বেকুব দেখেছি। সাহেব ছ'জন এই কথা শুনে অপমানিত বোধ করলো, উত্তেজিতও হলো এবং অবশেষে তাঁকে আক্রমণ করার উদ্যোগ করলো। কিন্তু তাঁর সুগঠিত শরীর আর দৃঢ় তেজোব্যঞ্জক মূর্তি দেখে নিরস্ত হলো ও ক্ষমা প্রার্থনা করলো। বুকভরা এমনি ছুর্জয় সাহস নিয়েই তো তিনি সারা ভারতবর্ষ, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

এইভাবে পাঁচ বছর ধরে পরিব্রাজকরূপে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ালেন। প্রত্যক্ষ করলেন দেশের অতীত ও বর্তমানকে। এই কয়েক বছরে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিন্তা ও চরিত্রে দেখা দিল এক আশ্চর্য পরিবর্তন। এই ভারত-পরিক্রমা তাঁর বৃথা হয়নি ; এর ভেতর দিয়ে তিনি জাতীয় জীবনের সত্যিকার পরিচয় লাভ করলেন।

সেই পরিচয় তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্দেশ করে দিল। হিমালয় থেকে কুমারিকা—অশ্রান্ত ভ্রমণে ক্লান্ত সন্ন্যাসী অবশেষে একদিন ভারত মহাসমুদ্রের তীরে ভারতের শেষ প্রস্তরখানির ওপর বসলেন। সেইখানে বসে নব্যভারতের মন্ত্রগুরু বিবেকানন্দ দেখলেন সামনে নীল সমুদ্র, পেছনে ভারতবর্ষ। স্বদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভেসে ওঠে তাঁর ধ্যানে।

এই আমার স্বদেশ, আমার ভারতবর্ষ। নিরন্ন বুভুক্ষু ভারতবর্ষ—আমার প্রিয় জন্মভূমি! রোগে জর্জর, ক্ষুধায় ক্লিষ্ট, ছিন্নবাস পরিহিত কোটি কোটি নরনারীর মিছিল যেন তাঁর দৃষ্টি পথে ধরা দেয়। সন্ন্যাসীর দুই চোখ জলে ভরে ওঠে। চকিতে কর্তব্য স্থির করে ফেলেন বিবেকানন্দ। ধর্ম নয়—ভারতবাসীর ঐহিক উন্নতিসাধনই হবে তাঁর জীবনব্রত। এই কাজেই তিনি তাঁব জীবন উৎসর্গ করবেন, মনে মনে সংকল্প করেন সন্ন্যাসী।

সম্মুখে উদ্বেলিত মহাসমুদ্র; তারই তটপ্রান্তে বসে ভারতের নবীন সন্ন্যাসীর অন্তর মথিত করে ওঠে এই কথা ঃ

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

ভারতের কোনো সন্ন্যাসীর কণ্ঠে এমন কথা কখনো শোনা যায়নি।

মনে পড়ল পোরবন্দরের সেই পণ্ডিত অধ্যাপকের কথা, যিনি বিবেকানন্দকে একদিন বলেছিলেন, স্বামীজি, আপনি পাশ্চাত্য দেশে যান; আপনার দেশের লোকের চেয়ে তারা আপনাকে ভাল বুঝবে। ভারতের দরকার পাশ্চাত্যের যন্ত্রবিজ্ঞান; পাশ্চাত্যের দরকার ভারতের আধ্যাত্মজ্ঞান। এই আদান-প্রদানের পথ তৈরি করতে হবে। এ কাজ আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

মনে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—খালি পেটে ধর্ম হয় না।

মনে পড়ল আমেরিকার চিকাগো শহরে আসন্ন বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের কথা। রামনাদের রাজা তাঁকে এর কথা বলেছিলেন।

সন্ন্যাসীর প্রশস্ত ললাট উদ্ভাসিত হয়ে উঠল— বিদ্যুৎগতিতে মনের মধ্যে খেলে যায় এক অভিনব সংকল্প। মোক্ষের দিকে নয়, ভারতবর্ষের দিকেই মুখ ফেরালেন তিনি।

কন্যাকুমারিকা থেকে বিবেকানন্দ এলেন মাদ্রাজে।

তখন ১৮৯২ শেষ হয়ে আসছে। মাদ্রাজ তাঁকে বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা জানালো। তখন তাঁর হৃদয়ে জেগেছে পুঞ্জীভূত শক্তির বিপুল তরঙ্গ, স্বদেশপ্রেমের তীব্র ব্যাকুলতা আর জীবনব্রত খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। তাই মাদ্রাজবাসীর কাছে তিনি সর্বপ্রথম তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। দলে দলে শিক্ষিত যুবকেরা গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যত্ব। একটা প্রবল উদ্দীপনা জাগল তাদের অন্তরে এই সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে। তারাই উদ্যোগী হয়ে স্বামীজিকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি করে চিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে পাঠায়। তারাই জনসাধারণের কাছ থেকে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করে দিয়েছিল তাঁর পাথেয়। এদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আলাসিঙ্গা পেরুমল। ইনি তাঁর গুরুর মিশনকে সফল করে তোলার জন্য সবচেয়ে বেশি চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করে দিয়ে সন্ন্যাসীর বিদেশ যাত্রার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন।

১৮৯৩, ৩১শে মে।

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ।

বোম্বাই থেকে জাহাজে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর। নতুন অভিযানে বের হলেন ভারতপ্রেমিক সন্ন্যাসী। জাহাজ ছেড়ে দিল। তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে ক্রমশ জন্মভূমির শেষ চিহ্ন মুছে যায়। কিন্তু হৃদয়ে রইল ভারতের চিন্তা, ভারতবাসীর চিন্তা। আরম্ভ হলো তাঁর জীবনের গৌরবময় অধ্যায়।

ছয়

চিকাগো।

আমেরিকার বিখ্যাত শহর চিকাগো।

সেই শহরে এসে উপনীত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে। মহাধর্ম সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার তখনো অনেক দেরী। এইখানে এই সম্মেলনের গোড়ার কথা একটু বলি।

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোতে একটা বিশ্বমেলা বসেছিল। ধর্মসম্মেলনটি ছিল এই মেলারই অঙ্গ। তখন উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয় হয়। এই একশো বছরের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ কত দূর উন্নত হয়েছে, মানুষের সভ্যতা কতখানি অগ্রসর হয়েছে, তারই একটা পরিচয় নানাভাবে দেখাবার আয়োজন হয় এই মেলায়। মেলার কর্মকর্তাগণ ভাবলেন সেই সঙ্গে আর একটা করলে ভালো হয় ; সভ্য মানুষ আধ্যাত্মিক চিন্তায় কতদূর এগিয়ে গেছে, তারো একটা অনুষ্ঠান করতে পারলে মন্দ হয় না। এই উদ্দেশ্য নিয়েই বিশ্বধর্ম-সম্মেলনের (পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নস) আয়োজন করা হয়েছিল। আরম্ভ হওয়ার পর থেকে এক নাগাড়ে সতেরো দিন ধরে চলেছিল এই ধর্মসম্মেলনের ঐতিহাসিক অধিবেশন।

এই মেলা আর এই ধর্মসম্মেলনের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে উদ্যোক্তাদের সময় লেগেছিল আড়াই বছর। পরিকল্পনাটা যিনি করেছিলেন তাঁর নাম চার্লস ক্যারোল বনি। এই ধর্মসম্মেলন এমন চমৎকার হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত চিকাগোর সেই বিশ্বমেলায় এইটাই দর্শকদের কাছে প্রধান আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল। মেলায় দেশ-বিদেশের হাজার হাজার দর্শকের সমাগম হয়েছিল। আর পৃথিবীর প্রচলিত যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এই ধর্মসম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন।

ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়ে এই বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন: ১. স্বামী বিবেকানন্দ (হিন্দুধর্ম); ২. জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী (থিওজফি); ৩. বীরচাঁদ গান্ধী (জৈনধর্ম); ৪. ভিক্ষু ধর্মপাল (বৌদ্ধধর্ম); এবং ৫. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বি. বি. নগরকার (ব্রাহ্মধর্ম)। সর্বসমেত পৃথিবীর এই দশটি প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন এই সম্মেলনে যোগদান করতে। যেমন—১. ইহুদী; ২. ইসলাম; ৩. হিন্দু; ৪. বৌদ্ধ; ৫. তাওইনম্, ৬. কনফুসীয়; ৭. সিন্টো; ৮. জরোথুস্ত্রীয়; ৯. রোমান ক্যাথলিক ও ১০. প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টানধর্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ছয় হাজার প্রতিনিধি সেদিন এই স্মরণীয় সম্মেলনে সমবেত হয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক নিমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবে চিকাগো ধর্মমহা-সম্মেলনে আসেননি। ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম। যখন তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখনই এক মাদ্রাজী অধ্যাপক আলাসিঙ্গা পেরুমল তাঁকে এইখানে আসবার জন্য উৎসাহিত করেন এবং তিনিই স্বামীজির পাথেয় বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। খেতড়ির মহারাজা—যিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন—এই ব্যাপারে স্বামীজিকে খুব সাহায্য করেছিলেন। যথাসময়ে তিনি এসে পৌঁছলেন চিকাগোতে। এসে শুনলেন যে, ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে তখনো তিন মাস দেরী। আর সেখানে

তাঁর প্রবেশের কোনো সুযোগই নেই। কারণ তিনি তো এই ধর্মমহাসভার পক্ষে থেকে কোনো নিমন্ত্রণ পাননি। প্রতিনিধি হবার সময়ও তখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সম্মেলন বসবে সেপ্টেম্বরে, তখন সবে জুলাই মাস। টাকা পয়সাও ফুরিয়ে এসেছে। প্রথম দশদিনের মধ্যে খরচ হয়ে গেছে দু'শো টাকা। কি করা যায়? একদিন একজন তাঁকে পরামর্শ দিলেন, বোস্টন শহরে যান, সেখানে কম খরচে থাকতে পারবেন।

বন্ধুহীন, পরিচয়হীন বিদেশে সন্ন্যাসীর উদ্বেগের শেষ নেই। কিন্তু তাই বলে নিরুৎসাহ হবার মানুষ ছিলেন না তিনি। অদম্য তাঁর আত্মবিশ্বাস! চললেন তিনি বোস্টনে। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন—এই অগ্নিময় বিশ্বাস বুকে নিয়ে বিবেকানন্দ চলেছেন বোস্টনের পথে। ঠাকুরের কি অসীম কৃপা! পথে এক মহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। মহিলাটির অন্তর করুণায় পূর্ণ, খুব ধনী। তিনি এই তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলেন এবং তাঁকে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। মহিলাটির নাম মিস কেটি স্যানবোর্ণ। বয়স চুয়ান্ন। বিদুষী ও সুলেখিকা। শহরের উপকণ্ঠে 'ব্রিজি মেডোস' নামে ছায়াঘেরা সুন্দর তাঁর বাড়িটি। পাইন গাছ আর আইভি লতায় ঘেরা এবং নানা রকমের ফুলে ভরা বাড়িটির মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ সন্ন্যাসীকে মুগ্ধ করলো। তার চেয়েও মুগ্ধ হলেন তিনি মহিলাটির আতিথেয়তায়।

বোস্টনে আসার কিছুদিন পরে অধ্যাপক জন হেনরি রাইট ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হলো বিবেকানন্দের। রাইট সাহেব হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। এই রাইট দম্পতি পরে স্বামীজিকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং তিনি যাতে চিকাগো বিশ্ব ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, সে বিষয়েও তাঁরা তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। এই রাইট পরিবারের সকলেই তাঁর অনুরাগী হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে তাঁরা 'আমাদের স্বামীজি' বলে

ডাকতেন। দিন যায়। ক্রমেই ধর্মমহাসভার দিন এগিয়ে আসছে। কিন্তু কিভাবে তিনি যোগদান করবেন তা বিবেকানন্দ বুঝে উঠতে পারলেন না। পরিচয়-পত্র নেই, অর্থের সম্বলও ফুরিয়ে আসছে। দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন তিনি। নিরুপায় হয়ে তাঁর মাদ্রাজী শিষ্যদের কাছে টাকা আর একটি পরিচয়-পত্রের জন্য চিঠি লিখলেন। এক অদম্য আত্ম-বিশ্বাস বুকে নিয়ে তিনি দিনগুলি অতিবাহিত করেন। দেখতে দেখতে অগস্ট মাস শেষ হয়ে এলো। এই সময়ে একদিন বৃদ্ধ অধ্যাপক রাইট তাঁকে বলেন, স্বামীজি, আপনি এই ধর্মমহাসভায় যোগদান করুন।

—তার তো কোনো উপায় দেখছিনে।

—ভারতবর্ষের কোন্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী আপনি?

আমি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। পরিচয়-পত্রের জন্য আমার শিষ্যদের কাছে চিঠি লিখেছি।

—ঠিক আছে। মহাসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার আমারই এক বন্ধুর ওপর আছে। তাঁর নামে আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি আপনাকে। আপনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন।

এই অপ্রত্যাশিত সাহায্যের মধ্যে বিবেকানন্দ যেন দেখতে পেলেন তাঁর গুরুর অদৃশ্য আশীর্বাদ।

ধর্মসম্মেলন আরম্ভ হওয়ার ঠিক দু'দিন আগে স্বামীজি এলেন চিকাগো শহরে। এসেই তিনি এক বিপদের মধ্যে পড়লেন। অধ্যাপক রাইট যে ভদ্রলোকের নামে চিঠিখানা দিয়েছিলেন, সেটা তিনি আর খুঁজে পান না। চিঠিতেই ঠিকানাটা ছিল তাঁর। এখন উপায়? এতবড় শহরে কোথায় তিনি তাঁর খোঁজ করবেন? দু'চার জনকে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তাদের কেউই বলতে পারে না। সন্ধ্যার সময় পথের ধারে একটি বেঞ্চির ওপর বিষণ্ণ মনে বসে আছেন বিবেকানন্দ। বসে বসে ভাবছেন—তবে কি এই ধর্মমহাসভায় তাঁর যোগদান করাটা গুরুর অভিপ্রেত নয়?

চকিতে মনে পড়ল সেদিনের কথা যেদিন তিনি সন্ধ্যায়

কন্যাকুমারিকার মন্দিরের ধাপে বসে ধ্যান করছিলেন। সম্মুখে ভারত মহাসমুদ্র, পিছনে ভারতবর্ষ। সেই সমুদ্রের ফেনায়িত তরঙ্গের ওপর তিনি কি রামকৃষ্ণদেবের জ্যোতির্ময় মূর্তিখানি দেখতে পাননি? সেই দিব্য মূর্তি কি তাঁকে অঙ্গুলি সংকেতে এই মহাদেশে আসবার জন্য নির্দেশ দেন নি? ক্লান্ত হয়ে হতাশ মনে বসে বসে যখন তিনি মনের মধ্যে এইসব কথা চিন্তা করছিলেন তখন—ঠিক সেই মুহূর্তে—তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন মূর্তিমতী আশীর্বাদের মতো এক অপরিচিতা মহিলা।

—আপনি কি ধর্মমহাসম্মেলনের একজন প্রতিনিধি?

—ঠিক প্রতিনিধি নই। প্রতিনিধি হবার জন্য এসেছি।

—তবে এখানে বসে আছেন কেন। আর দু'দিন বাদেই তো সম্মেলন আরম্ভ হবে।

তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সব কথা খুলে বললেন।

মহিলাটির অন্তর স্পর্শ করলো তাঁর কথাগুলি।

তিনি পরম সমাদরের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে। বললেন, আপনার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। এই ভদ্রমহিলাটির নাম শ্রীমতী জর্জ ডাব্লিউ হেল। এই হেল-দম্পতী পরে স্বামীজির অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩।

এইদিন চিকাগোর প্রসিদ্ধ আর্ট প্যালেসের কলম্বাস হলে বিশ্বধর্ম-সম্মেলনের উদ্বোধন হলো। বিবেকানন্দের জীবনে এই দিনটি যেমন স্মরণীয়, ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসেও এটি এক অবিস্মরণীয় দিন। বেলা দশটা বাজল। সভার কাজ আরম্ভ হলো। পৃথিবীর দশটি প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছেন। প্রায় চার হাজার দর্শকের সমাগম হয়েছে। মঞ্চের ওপর বিচিত্র বেশভূষার সহিত প্রতিনিধিরা বসেছেন। মাঝখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রধান পুরোহিত

কার্ডিনাল গিবনস্। তাঁর ডান পাশে বসেছেন দশ জন চীনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। বাঁদিকে গ্রীক চার্চের ধর্মযাজকগণ। জাপানী বৌদ্ধ প্রতিনিধি, সিংহলের বৌদ্ধ প্রতিনিধি, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলেই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসেছেন। আর এঁদের মাঝখানে বসে আছেন হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিই ছিলেন বয়সে সকলের চেয়ে ছোট, কিন্তু জ্ঞানে ও মনীষায় শ্রেষ্ঠ। পরিচয়-হীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। তরুণ বয়স। মুখে চোখে মহিমার দীপ্তি, পরিধানে গেরুয়া রঙের একটা আজানুলম্বিত আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া রঙের একটা বিরাট পাগড়ি। চমৎকার বেশ। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ তাঁর ওপর।

সভার কাজ আরম্ভ হলো।

সতেরো দিন ধরে চলেছিল এই ধর্মসম্মেলন।

সভাপতির আহ্বানে প্রতিনিধিরা একে একে এসে বক্তৃতা দিতে থাকেন। সকলেরই তৈরি বক্তৃতা। সকলেই নিজের নিজের ধর্মের ঢাক পেটালেন। বিকাল বেলার অধিবেশনে সভাপতি আহ্বান করলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। এত বড়ো সভায় হাজার হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কেমন করে বক্তৃতা করবেন? স্মরণ করলেন মনে মনে ইষ্টদেব রামকৃষ্ণকে। অমনি প্রেরণার নির্ঝর নেমে আসে তাঁর অন্তরে—জিভের ডগায়। একটা অভূতপূর্ব আবেগে স্পন্দিত হয়ে উঠলো তাঁর সমগ্র সত্তা।

'সে এক বিচিত্র অনুভূতি। কি বলব, কেমন করে বলব, এ সব কিছুই তখন জানতাম না। সেই হাজার হাজার লোকের সামনে আমার বুক যেন সত্যিই কাঁপছিল। আমাকে বার বার তিন বার ডাকা হয়েছিল বক্তৃতা দেবার জন্য। প্রথম দু'বারই আমি সভাপতিকে বলে-ছিলাম, এখন নয়, পরে। শেষবার তিনি যখন আমাকে জানালেন যে এবার বক্তৃতা দিতে না উঠলে আর আপনাকে সুযোগ দেওয়া হবে না, তখন স্মরণ করলাম গুরুদেবকে। মনে মনে ভাবলাম, আমি তো

তাঁরই আজ্ঞাবহ দাস, আমি ভাববার কে? যিনি আমাকে নানা বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে এতদূর নিয়ে এসেছেন তিনিই তাঁর কথা বলবেন। যা বলবার তিনিই আমার মুখ দিয়ে বলাবেন। আমি নিমিত্ত মাত্র।'

মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী।

দাঁড়ালেন দৃপ্ত ভঙ্গিমায়—যেন জ্বলন্ত তলোয়ার।

সকল দর্শকের দৃষ্টি এখন তাঁর ওপর। সকলেই উৎকর্ণ তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য। কৌতূহল আর আগ্রহ সকলের মুখে চোখে। সমস্ত সভ্য জগৎ সে দিন শুনল ভারতবর্ষের হাজার বছরের সভ্যতার কথা, তার সনাতন ধর্মের বাণী। বিবেকানন্দের কণ্ঠকে আশ্রয় করে প্রাচীন ভারত আহ্বান করল নবীন মহাদেশকে। চকিতে তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়—'হে আমার আমেরিকাবাসী ভাই-বোনেরা।'

'Brothers and sisters of America!'—এ কী আত্মীয়তার সুর বক্তার কণ্ঠে। এমন অন্তরঙ্গ সম্বোধন আমেরিকা তো শোনেনি এর আগে। শোনেনি য়ুরোপ। ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হয় বিরাট সভাগৃহ। তার মধ্যে ডুবে যায় বক্তার কণ্ঠস্বর। শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন তিনি। আবেগের বেগে তাঁর মুখের উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথা যেন হয়ে ওঠে দিব্য বাণী যা শ্রোতার কানের ভেতর দিয়ে তার মর্মে গিয়ে পৌঁছয়। সে বাণী মুহূর্ত মধ্যে জয় করল সকলের চিত্ত। পৃথিবীতে এর আগে কিম্বা পরে আর কোনো বক্তার ভাগ্যে এমন সৌভাগ্য লাভ ঘটেনি।

পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজি গভীরভাবে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর সংস্কৃত উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ, তেমনি বিশুদ্ধ ছিল তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ। বিশুদ্ধ আর উদাত্ত। প্রথম দিনের বক্তৃতায় তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে দুটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যকে পরিষ্কার করে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সেই স্মরণীয় ভাষণের একটুখানি এখানে তুলে দিলাম।

'যে ধর্ম জগৎকে অন্যের মত সহ্য করতে এবং সকল মতের সর্বজনীনতা'কে স্বীকার করতে শিখিয়েছে, আমি সেই প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। আমি এই ধর্মভুক্ত বলে গৌরব বোধ করে থাকি। আমরা কেবল সকল মতই বিশ্বাস করি না, আমরা পৃথিবীর সকল ধর্মকেই সত্য বলে মানি। যে জাতি পৃথিবীর সকল দেশের উৎপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী নরনারীকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আশ্রয় দিয়েছে, আমি সে জাতির একজন বলে গর্ববোধ করি।'

'সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও বহুবিধ সংকীর্ণতার ফল হয়েছে ধর্মান্ধতা আর এই ধর্মান্ধতাই অনেকদিন ধরে এই সুন্দর পৃথিবীর ওপর আধিপত্য করেছে। এইগুলি জগতে হিংস্র উপদ্রব করেছে, বার বার একে নরশোণিতে প্লাবিত করেছে, মানব সভ্যতাকে উৎসন্নে দিয়েছে এবং এক একটি জাতিকে নৈরাশ্যে অভিভূত করেছে। ধর্মান্ধতার এই দানবটা যদি না থাকত, তাহলে মনুষ্যসমাজ আজকের চেয়ে অনেক উন্নত হতো, অনেক সুন্দর হতো। তবে আমি আশা করি মানুষ একদিন তার চরম লক্ষ্যে পৌছবেই ; সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অন্ধকার কেটে যাবেই।'

পরের দিন সব খবরের কাগজে বিবেকানন্দের এই বক্তৃতার প্রশংসা বেরুলো। একদিনেই সারা মার্কিন দেশে ছড়িয়ে পড়ল এই হিন্দু সন্ন্যাসীর নাম। ভিক্ষুকের জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠলো সমস্ত আমেরিকা। একদিন যিনি অপরিচিতের মতো প্রবেশ করেছিলেন এই মহাদেশে, আজ তিনিই হয়ে উঠলেন সব চেয়ে বিখ্যাত। রাস্তায় রাস্তায় বিক্রী হতে লাগল হাজারে হাজারে তাঁর ছবি—সেই বিচিত্র গৈরিক উষ্ণীষে শোভিত আর গৈরিক বস্ত্র পরিহিত দৃপ্ত সন্ন্যাসীর নয়নলোভন মূর্তি যে একবার দেখে সেই মুগ্ধ হয় আর মনে মনে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করে তাঁর উদ্দেশে।

জৈনধর্মের প্রতিনিধি বীরচাঁদ গান্ধী ওদেশের একটি কাগজে

লিখেছিলেন, 'চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের মতো সফলতা আর কোনো প্রতিনিধি অর্জন করতে পারেন নি। এই তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসীই ছিলেন প্রধান বক্তা, তিনিই সকলের দৃষ্টি সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিলেন। শ্রোতারা শুধু তাঁরই বক্তৃতা শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ বাগভঙ্গী, যুক্তির সারবত্তা, সিদ্ধান্তের সমীচীনতা—সব কিছু মিলিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা সকলকেই মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিল। সমাগত আর কোনো বক্তাই এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি যেমনটি পেরেছিলেন এই তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী।'

চিকাগো ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দের এই অপূর্ব সাফল্যের মধ্যে সেদিন ঝংকৃত হয়েছিল ভারতের নবযুগের আগমনী। চিকাগোতে বিবেকানন্দের এই বিজয় সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে ছিল ভারতেরই বিজয় —হিন্দুধর্মের বিজয়।

সাত

SWAMI VIVEKANANDA—THE HINDU MONK OF INDIA

ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

এই নামটি আজ বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত আমেরিকায়।

সেই মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছোট বড়ো সকল শহরে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর নাম। ধর্মপিপাসু বহু নর-নারী এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। নানা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। বিশ্ব ধর্মসম্মেলনের শেষের অধিবেশনে খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে তুমুল বিতর্ক উঠেছিল। এই ধর্মের প্রতিনিধি যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা দাবী করলেন যে, পৃথিবীতে তাঁদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ—খ্রীষ্টান ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম।

প্রতিবাদ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রতিবাদ না করে তিনি থাকতে পারেন নি। ওদেশে বেদান্ত প্রচার করা—এটাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। আমেরিকার মতো দেশে গোঁড়া পাদ্রীদের বিরুদ্ধাচারণ করা রীতিমত দুঃসাহসের কাজ ছিল সেদিন। তর্কটা উঠেছিল সম্মেলনের দ্বাদশ দিনে। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ তাঁদের ধর্মের শ্রেষ্ঠতা

প্রতিপন্ন করলেন। চীন, জাপান ও ভারতের প্রতিনিধিরা সবাই এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে, তীব্রভাবে পাদ্রীদের সমালোচনা করেন। সব শেষে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অকাট্য যুক্তি জাল বিস্তার করে, তিনি যখন ভারতে পাদ্রীদের কার্যকলাপের প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরলেন শ্রোতাদের সামনে তখন সভায় সে কী উত্তেজনা, সে কী বিস্ময়। তাঁর সেদিনকার বক্তৃতার কিছুটা এখানে তুলে দিলাম ঃ

'খ্রীষ্টান পাদ্রীরা অনেক কাল ধরেই ভারতবর্ষে এসে থাকেন। কিন্তু তাঁরা সেখানে করেন কি ? অশিক্ষিতদের দেখান প্রাচুর্যের প্রলোভন। যদি কোনো হিন্দু সন্তান তার পিতা-পিতামহের ধর্মত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে জীবনে তার কোনো অভাব থাকবে না—মূর্খের মতো পাদ্রীরা এইসব ভাঁওতা দিয়ে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, এ কি ঠিক ? যদি তোমরা সত্যিই ভ্রাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকো, যদি তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সন্তান যীশু খ্রীষ্টের প্রেম থাকে, তাহলে হিন্দুর প্রতি সদয় ও সপ্রীতি ব্যবহার করতে শেখো। ভারতবর্ষের প্রয়োজন অর্থ—ধর্ম নয়। কেমন করে অর্থ উপার্জন করতে হয় তাই শেখাবার জন্য পাদ্রীদের ভারতে পাঠাও, ধর্মের কথা সেখানে প্রচার করবার দরকার নেই।'

গোঁড়া পাদ্রীরা স্বামীজির এই কথায় খুব রেগে যায় তাঁরা তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে তাদের মনে খুব ঈর্ষার সঞ্চার হলো। এমন কি, তারা তাঁর নির্মল চরিত্র সম্পর্কে নানা প্রকার কুৎসা রটনা করতে দ্বিধা করল না। কিন্তু সন্ন্যাসী এতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না ; তিনি তাঁর কর্তব্যে অটল অচল রইলেন। ইতিমধ্যে অতলান্তিক মহাসাগর পার হয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছল বিবেকানন্দের বিজয়-বার্তা। তাঁর স্বদেশবাসীর বিস্ময় ও আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। আর তাঁর গুরুভাইদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বৃথা বলেন নি যে, নরেন একদিন দুনিয়াটাকে দু'হাত দিয়ে নাড়া দেবে।

চিকাগোর ধর্ম মহাসভায় তারই প্রথম আভাস দেখা গিয়েছিল। ভারতবাসী কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে শুনলো এই বীর সন্ন্যাসীর আমেরিকা বিজয়ের বিবরণ। তাঁর জন্মভূমি কলকাতায় শিক্ষিতদের মধ্যেও উৎসাহ ও আনন্দ দেখা দিল। টাউন হলে এক বিরাট সভার আয়োজন হলো। সেই সভায় শহরের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সেই স্মরণীয় সভায় হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর কাজের জন্য অভিনন্দিত করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবের একটি নকল স্বামীজির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেটি পেয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'টাউন হলের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবটি আমি পেয়েছি। আমার জন্মভূমির অধিবাসীদের সদয় বাক্যে এবং আমার সামান্য কাজের সহৃদয় অনুমোদনের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।'

ধর্ম মহাসভার অধিবেশন শেষ হয়ে গেল।

এর পর প্রায় এক বছর পর্যন্ত বিবেকানন্দ আমেরিকার নগরে নগরে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। এর মধ্যে ডেট্রয়েট শহরে ইউনিটেরিয়ান গীর্জায় ধারাবাহিক ভাবে তিনি কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর চার মাস ধরে তিনি অক্লান্ত ভাবে চিকাগো, নিউইয়র্ক ও বোস্টনের চার পাশের অনেক স্থানে বক্তৃতা দিতে থাকেন। প্রথম প্রথম তিনি এক বক্তৃতা-প্রযোজক কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ছিলেন। তারাই বক্তৃতার স্থান ও সময় ঠিক করে দিত আর তিনি ঠিক করে দিতেন তাঁর বক্তৃতার বিষয়। এর ফলে ওদেশের শহরে শহরে বক্তৃতা করে বিবেকানন্দ অনেক টাকা উপায় করেছিলেন। এর থেকে কিছু টাকা তিনি বরাহনগরের বিখ্যাত সমাজ সেবাব্রতী শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছিলেন আর বাকী টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে। এক-একটা বক্তৃতায় তিনি কুড়ি থেকে আশি ডলার পর্যন্ত পেতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশি দিন চলে

নি। এরপর তিনি আর চুক্তিবদ্ধভাবে কোথাও বক্তৃতা দিতেন না, নিজেই স্বাধীনভাবে বক্তৃতা করতেন।

শুধু বক্তৃতা দিয়ে তিনি নিরস্ত ছিলেন না। তিনি কয়েকজন উদ্যোগী ও অনুরাগী শিষ্যদের নিয়ে ভজনযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস খুলে দিলেন। নিউ ইংলণ্ডের অন্তর্গত 'গ্রীন একার' নামক স্থানে কয়েকজন ছাত্র বেদান্ত দর্শন শিক্ষা করবার জন্য এলেন তাঁর কাছে। তিনি আগ্রহের সঙ্গে তাদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ব্রুকলীন শহরের একটি নৈতিক সভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। তাঁর প্রত্যেক বক্তৃতাতেই হাজার হাজার শ্রোতার সমাগম হতো। সকলেই আগ্রহে শুনতো তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশ। ইতিমধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত মার্কিন নর-নারী স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর প্রচারকার্য সহায়তা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মাদাম মেরি লুই, ডাক্তার স্ত্যাণ্ডসবার্জ, মিসেস ওলিবুল, ডাক্তার য়্যালেন, মিস ওয়াল্ডো, অধ্যাপক ওয়েমান এবং রাইট প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। পরে এঁদের কেউ কেউ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। নিউ ইয়র্কের ধনী সমাজের মিস্টার ও মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট ও মিস জে. ম্যাক্লিয়ডও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর প্রচারকার্যে সহায়তা করেছিলেন। সুবিখ্যাত গায়িকা মাদাম কালভে পর্যন্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

অশ্রান্তভাবে দিনের পর দিন কাজ করে চলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বক্তৃতা দেওয়া, ক্লাস করা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা আর জ্ঞানান্বেষী শিষ্যদের নিয়ে শাস্ত্রীয় বিষয় আলোচনা ইত্যাদি কাজের যেন বিরাম নেই। পাশ্চাত্যের জীবন খুঁটিয়ে দেখা আর ধর্মানুরাগীদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হওয়া এইসব বিবিধ কাজের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয় সন্ন্যাসীর দিনগুলো। কিন্তু এতসব কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও তিনি একদিনের জন্যও তাঁর স্বদেশকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। চারদিকে প্রাচুর্য আর আরামের

পরিবেশ। চারদিকে বিলাসের সহস্র উপকরণ। চারদিকে ভোগের সমারোহ। যখন যে বাড়িতে অতিথি হয়ে বাস করেন, সেখানেই দেখেন যে তাঁর শোবার জন্য দুধের ফেনার মতো সাদা আর পাখির পালকের মত নরম বিছানা রয়েছে। যখনই সেই আরামদায়ক বিছানায় তিনি শুতে যান অমনি বিবেকানন্দ তাঁর শরীরে বোধ করেছেন হাজার বিছের কামড়।

তাঁর এই সময়কার মনের ভাব প্রকাশ করে এক চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন : 'আমি এই আরামের মধ্যে রয়েছি। আর আমার নিরন্ন নিপীড়িত দেশের লক্ষ ভাই-বোনের দু'মুঠো অন্ন জোটে না। আকাশের তলায় তারা আশ্রয় খোঁজে। এই আরামের শয্যা আমার নয়।' চোখের জলে বালিশ ভিজে যেত। নরম বিছানায় যেন হাজার কাঁটার স্পর্শ। মেঝেতেই পড়ে তিনি রাত কাটাতেন। সাত হাজার মাইল দূরে ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কঙ্কালসার অর্ধ-উলঙ্গ অধিবাসী সাত হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে যেন এক নিমেষে সন্ন্যাসীর মনের মধ্যে ভীড় করে দাঁড়ালো। অমনি তাঁর অন্তর সমবেদনায় কেঁদে উঠতো : 'মা, কি হবে প্রতিষ্ঠায়, চাই না খ্যাতি, চাই না যশ। কেমন করে মুছিয়ে দেব আমার দেশের কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের চোখের জল ?'

গেরুয়া কাপড়ের অন্তরালে সন্ন্যাসীর এই যে কোমলতাপূর্ণ হৃদয় —এর কি কোনো তুলনা আছে ? এমন সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। এমন মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসীর কথা কে কবে শুনেছে ?

বিবেকানন্দের বিশ্রাম নেই।

অশ্রান্তভাবে চলেছে তাঁর প্রচার অভিযান।

এক বছরের মধ্যে তিনি অতলান্তিক উপকূল থেকে মিসিসিপি নদীর তীর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান শহরে

ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়ালেন। এই হিন্দু সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে যেন এক নবজীবনের তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো এখানকার নরনারীদের হৃদয়ের মধ্যে। অদ্বৈত বেদান্তের উদার বাণীর মধ্যে তারা খুঁজে পায় এক নতুন জীবন দর্শন। প্রাচীন ভারতবর্ষ আজ আর বেদ-বেদান্ত উপনিষদের মহিমা নিয়ে এক নতুন রূপে তাদের চিন্তা ও চেতনায় যেন ফুটে উঠলো। ধন-গর্বিত মার্কিন সভ্যতা উপলব্ধি করলো ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব। চীর-গৈরিকধারী সন্ন্যাসীকে উপলক্ষ করে ভারতবর্ষের উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করলো পাশ্চাত্য মহাদেশ।

ডেট্রয়েট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র ও শিল্পকেন্দ্র ডেট্রয়েট শহর। আবার এখানকার প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। এই শহরে স্বামীজি দু'বার এসে বক্তৃতা দিয়ে এখানকার অধিবাসীদের মনে এক তুমুল আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিলেন। এখানে পাদ্রীদের বিলক্ষণ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। এখানে তাঁর যোদ্ধৃমূর্তি দেখে পাদ্রীরা রীতিমত ভয় পেয়েছিল।

১৮৯৫ সাল থেকে নিউইয়র্ক শহরকে তাঁর কর্মের প্রধান কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত করে, বিবেকানন্দ তাঁর কাজের ধারা বদলালেন। এখানে ওখানে যাওয়া কিংবা ঘরোয়া আলোচনা সব বন্ধ করে দিলেন। এখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এবার দরকার কয়েকজন সত্যনিষ্ঠ আর উৎসাহী ছাত্র। তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তৈরি করতে পারলেই তাঁর আমেরিকায় আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সেই কাজেই তিনি এইবার বিশেষভাবে মন ঢেলে দিলেন। স্থাপন করলেন বেদান্ত সোসাইটি—অদ্বৈত বেদান্তের প্রথম দুর্গ। সোসাইটিতে লেকচার ক্লাস খুলে তিনি বিনা মূল্যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। এই ভাবেই সেদিন যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্ত প্রচারের সূচনা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পরবর্তী কালে তাঁরই গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ তাঁর কাজকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছিলেন।

১৮৯৫ সালের মাঝামাঝি স্বামী বিবেকানন্দ এলেন ইংলণ্ডে। তিন মাস এখানে বেদান্ত প্রচার করে তিনি আবার আমেরিকায় আসেন ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষ। এবার তাঁকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এর আগে কোনো ভারতীয় এই সম্মান লাভ করেননি। এইখানে ১৮৯৬ সালের ২৫শে মার্চ তিনি বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে একটি চমৎকার বক্তৃতা করেন বিদগ্ধ মণ্ডলীর সামনে। বক্তৃতা শুনে সকলেই তাঁর পাণ্ডিত্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বার আমেরিকায় এসে তিনি প্রায় পাঁচমাস কাল অবস্থান করেন এবং তারপরে আবার য়ুরোপে ফিরে যান। আমেরিকায় তিনি প্রায় আড়াই বছরকাল প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

এইবার লণ্ডনকে কেন্দ্র করে বিবেকানন্দ য়ুরোপ মহাদেশে বেদান্তের বাণী প্রচার করতে মনস্থ করলেন। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র লণ্ডন। সেই লণ্ডন সন্ন্যাসীকে জানালো স্বাগতম্। খ্যাতি তাঁর পুরোগামী ছিল—তাই এখানকার বিদগ্ধসমাজ তাঁর কণ্ঠে অদ্বৈত বেদান্তের বাণী শুনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। দেবদূতের মতো তাঁর সুন্দর সৌম্য উজ্জ্বল মূর্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর যশোগানে পরিপূর্ণ হয় ইংলণ্ডের আকাশ বাতাস। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে হিন্দুযোগীর নাম। দলে দলে লোক আসে তাঁকে দেখতে। তাঁর বক্তৃতা শুনতে তাদের আগ্রহের যেন সীমা নেই। সকলেই মুগ্ধ হয় তাঁর বক্তৃতা ও ধর্মোপদেশ শুনে। পিকাডিলির প্রিন্সেস হলে প্রথম যেদিন বক্তৃতা করলেন, তার বিবরণ পরের দিন সমস্ত সংবাদপত্রে ভালভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। বিবেকানন্দ এতটা আশা করেননি। সবাই বললো রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের পর এমন শক্তিশালী ভারতীয় ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে আর কখনো অবতীর্ণ হননি। একমাসের মধ্যেই তিনি লণ্ডনে বিপুল প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। এই সময়ে তাঁর একটি

বক্তৃতা সভায় এক বিদুষী আইরিশ মহিলা—কুমারী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল স্বামীজির সঙ্গে পরিচিতা হন। ইনিই পরে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে তাঁর গুরুর দেশে চলে আসেন। তখন এঁর নাম রাখা হয় 'নিবেদিতা'। এদেশের কাজেই তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

একদিন।

লণ্ডনের এক সভায় একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, স্বামীজি, আপনি তো হিন্দু সন্ন্যাসী, আপনি যীশুখ্রীষ্ট বা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে যখন কিছু বলেন তখন তা আপনার পক্ষে অনধিকার চর্চা হয় না কি?

এর উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ মহামানব যীশু প্রাচ্যদেশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন; আমিও প্রাচ্যদেশের সন্ন্যাসী। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য জগৎ এখনো এই ঈশ্বরের সন্তানকে চিনতে পারেনি অথবা তাঁর উপদেশের মর্ম ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। যীশু কি বলেননি—'যাও তোমার সর্বস্ব বিলিয়ে এসো, তারপর আমার অনুসরণ কর?'

এই কথা শুনে প্রশ্নকর্তা নীরব হন।

আর একদিন অক্সফোর্ডে গিয়ে স্বামীজি বিখ্যাত জর্মন পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কিছুদিন আগে ম্যাক্সমুলার রামকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেটি পাঠ করা অবধি তিনি য়ুরোপে এই বিখ্যাত মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ব্যগ্র হন। একদিকে পক্বকেশ ম্যাক্সমুলার অন্যদিকে তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। এ যেন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে নবীন য়ুরোপের সাক্ষাৎকার।

—আপনার পাণ্ডিত্য আর ভারতপ্রীতির কথা শুনে অবধি আপনার প্রতি আমার সমস্ত অন্তর শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে।

—আপনি যাঁর শিষ্য তাঁর কথা আমি যতই আলোচনা করছি ততই তাঁর প্রতি আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে। আমার খুব ইচ্ছা যে আমি তাঁর সম্পর্কে একখানা জীবনী লিখি।

—বেশ তো। আমি আপনাকে এর জন্য দরকারী তথ্য সংগ্রহ করে দেব।

এর কিছুকাল পরেই অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ইংরেজিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ' নাম দিয়ে একখানি বই লেখেন এই বইটি ওদেশে বিবেকানন্দের প্রচারকার্যের পথ অনেকখানি সুগম করে দিয়েছিল। সেদিন এই একখানি বইয়ের ভেতর দিয়ে য়ুরোপ যেন নতুন করে বুঝতে পেরেছিল ভারতের শাশ্বত আধ্যাত্মিক মহিমা।

এরপর তিনি জেনেভা, সুইজারল্যাণ্ড, জর্মনি, ইতালি প্রভৃতি দেশগুলি ভ্রমণ করেন। সর্বত্র স্বামীজি বিপুলভাবে সংবর্ধিত হয়েছিলেন, সর্বত্রই তাঁর বক্তৃতা আর উপদেশ শুনে সকলে মুগ্ধ হয়। য়ুরোপের লোক তাঁর নাম দিয়েছিল 'সাইক্লোন সাধু'। সত্যি, ঝড়ের উদ্দাম গতিতে তিনি যেন অবিরাম দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে চলতেন। একটা প্রচণ্ড কর্মশক্তির আধার ছিলেন বিবেকানন্দ। জর্মনিতে এসে তিনি বৈদান্তিক পণ্ডিত পল ডয়শনের সঙ্গে মিলিত হন ও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে খুশি হন। এই ভাবে আমেরিকা ও য়ুরোপে প্রায় চার বছর ধরে অক্লান্তভাবে বেদান্ত আর সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করে, ১৮৯৬ সালের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ যশের মুকুট মাথায় পরে ভারতবর্ষে ফিরলেন। ভারতমাতা তাঁর বিজয়ী সন্তানকে কোলে তুলে নিলেন।

আট

'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।'

চার বছরের অক্লান্ত ভ্রমণ শেষ করে, জন্মভূমিতে পদার্পণ করে স্বামীজির প্রথম বাণী ছিল: 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। আমরাই এখন জগতে শিক্ষাগুরুর স্থান নেব।'

বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরে আসছেন।

ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারিত হলো এই শুভ সংবাদ।

সর্বত্র তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আয়োজন হয়। সর্বপ্রথম তিনি অভ্যর্থিত হলেন সিংহলে। সিংহলের রাজধানী কলম্বো শহরের অধিবাসীদের মধ্যে সে কী স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনা যেদিন তিনি জাহাজ থেকে সেখানে অবতরণ করলেন। সেখানকার হিন্দু-সমাজ জানায় তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। সমুদ্রতীরে সমবেত বিপুল জনতার হর্ষোচ্ছল কণ্ঠে উঠলো সন্ন্যাসীর জয়ধ্বনি। সেখান থেকে গাড়ি করে তিনি নগরে প্রবেশ করলেন—তাঁর পিছনে ও সামনে সিংহলী নরনারীর শোভাযাত্রা। রাজপথের স্থানে স্থানে তাঁর সম্মানে তৈরি হয়েছে কত তোরণ, তোরণ-শীর্ষে কত পতাকা। ফুলের মালা

আর লতায় পাতায় শোভিত দারুচিনি উদ্যানের সামনে একটি বিরাট মণ্ডপ। সেইখানে স্বামীজিকে অভিনন্দন দেওয়া হলো।

চার বছর আগে যখন তিনি ভারতবর্ষ থেকে পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন, সেদিন বিবেকানন্দ ছিলেন একজন অখ্যাত পরিব্রাজক সন্ন্যাসীমাত্র—আর আজ তিনি বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী। তাঁর যশোগানে দিক্‌দিগন্ত আজ মুখরিত। সেদিনের সেই কপর্দকহীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আজ ভারত সমুদ্রতীরে সিংহলের রাজধানীতে রাজকীয় সম্মানে অভ্যর্থিত হলেন। এ ইতিহাস মনে রাখবার মতো।

পাঁচ দিন পরে সিংহল থেকে একটি স্টীমারে করে স্বামীজি যাত্রা করলেন ভারত অভিমুখে। সঙ্গে কয়েকজন শিষ্য আর গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। রামনাদে নামলেন তিনি। এক বিপুল জনতা সমুদ্রতীরে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছিল; তাদের পুরোভাগে ছিলেন রামনাদের রাজা ভাস্করবর্মা স্বয়ং। ইনি স্বামীজির একজন অনুরাগী শিষ্য। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। পশ্চিম আকাশে আবীরের গুঁড়ো। সেই বিচিত্র পরিবেশে স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ করলেন বিবেকানন্দ। হাজার হাজার লোক জানায় প্রণতি। এমন দৃশ্য এদেশে কখনো দেখা যায় নি। সমুদ্রতীরে সুন্দর চাঁদোয়া খাটানো একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করা হয়; স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় মানপত্র। সকলকে সানুরাগ ধন্যবাদ জানিয়ে স্বামীজি মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি বক্তৃতা করলেন।

পরের দিন তিনি রামেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে গেলেন। মনে পড়ল, পাঁচ বছর আগে এইখানে তিনি তাঁর পরিব্রাজক-ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন একজন অপরিচিত সন্ন্যাসীমাত্র। এইখানে মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন—যত্র জীব তত্র শিব। এমন কথা ভারতবর্ষের আর কোনো সাধুর মুখে কখনো উচ্চারিত হয় নি। এরপর মাদুরা, ত্রিচিনোপল্লী, তাঞ্জোর ও কুম্ভকোনম প্রভৃতি শহর হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এলেন মাদ্রাজে।

মাদ্রাজ সেদিন নবজীবনের গৌরব লাভ করেছিল। প্রতি গৃহ চূড়ায় দুই রঙের পতাকাবলী, তোরণে তোরণে শোভিত রাজপথে অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি। মাদ্রাজ বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করলো সন্ন্যাসীকে। তাঁকে উপহার দেওয়া হলো নারিকেল প্রভৃতি ফল। কোনো কোনো পুরনারী প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে তাঁকে পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে ভক্তি সহকারে আরতি করতে লাগলেন, দিতে লাগলেন তাঁর পায়ে পুষ্প চন্দনের অর্ঘ্য।

একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে হাজার হাজার জনতার সম্মুখে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হলো। খেতড়ির মহারাজা একখানি অভিনন্দন-পত্র পাঠিয়েছিলেন, প্রথমে সেইখানি পাঠ করা হয়। তারপর বিভিন্ন সম্প্রদায়, সভা ও সমিতির পক্ষ থেকে সংস্কৃত, ইংরেজি, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় প্রায় কুড়িখানা অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হয় সেই সভায়। দশ হাজারের বেশি লোক উপস্থিত ছিল এই স্মরণীয় সভায়। মাদ্রাজে তিনি নয় দিন ছিলেন, এই নয় দিন যেন মাদ্রাজের নরনারীর জীবনে নবরাত্রির উৎসব এনে দিয়েছিল।

কলম্বো থেকে মাদ্রাজ—এই সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করবার সময় বিবেকানন্দ যে সব বক্তৃতা করেন তার মধ্যে নতুন চিন্তা, নতুন ভাব আর নতুন কর্মপদ্ধতির পরিচয় পেয়ে সকলেই বুঝলেন যে, নবযুগের সূচনা করবার মতো প্রতিভা ও অসামান্য হৃদয় নিয়েই এই বীর সন্ন্যাসী স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন। পুনা থেকে জননায়ক বালগঙ্গাধর তিলক তাঁকে একবার পুনা যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু কলম্বো থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বক্তৃতা, কথোপকথন, দেখা সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে তিনি তখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে স্বামীজি জলপথে কলকাতায় ফিরলেন।

খিদিরপুরের জাহাজ ঘাট।

ডেকের ওপর সহাস্য বদনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

কতকাল বাদে তিনি কলকাতায় ফিরছেন। জাহাজ ঘাটেই তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছেন কয়েকজন গুরুভাই। সেখান থেকে ট্রেনে করে তিনি এলেন শিয়ালদহ স্টেশনে। স্টেশনের বাইরে অপেক্ষমান বিপুল জনতার কণ্ঠে জয়ধ্বনি ওঠেঃ জয় বিবেকানন্দ স্বামীজি কি জয়। তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে। স্বামীজি ট্রেন থেকে নেমে সহাস্য মুখে সমবেত জনতাকে যুক্ত করে প্রণাম করলেন। কলকাতার ছাত্রসমাজের কয়েকজন এগিয়ে এসে বলে ঘোড়ার বদলে আমরা আপনার গাড়ি টানব। দুপুর বেলায় বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়িতে বিশ্রাম করে বিকাল বেলায় তিনি সদল বলে কাশীপুরে গোপাল শীলের বাগানবাড়িতে এলেন। সঙ্গে যে কয়জন পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যা ছিল তাদের সকলে সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাত্রি বেলায় তিনি আলমবাজার মঠে এসে গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি যখন বিদেশে ছিলেন তখন বরাহনগর থেকে মঠ আলমবাজারের উঠে আসে।

২৮শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৭।

শোভাবাজারে রাধাকান্ত দেবের বাড়ি। সেই বাড়ির সুবিস্তৃত অঙ্গনে ঐদিন স্বামী বিবেকানন্দকে প্রকাশ্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব একটি রূপোর আধারে স্বামীজির হাতে দিলেন অভিনন্দন-পত্র; তিনিই সেটি পাঠ করেন। প্রায় পাঁচ হাজার লোক এই স্মরণীয় সভায় উপস্থিত ছিল। আর একদিনের একটি সংবর্ধনা সভায় স্বামীজি বললেন, 'আমি কত বিদেশ ঘুরে এলাম, কিন্তু স্বদেশের ধূলিকণা আমার কাছে সবচেয়ে পবিত্র। ভারতবর্ষ আমার চিরজন্মের তীর্থ।'

মানবপ্রেমিক এই সন্ন্যাসী একজন সত্যিকার ভারতপ্রেমিক ছিলেন। শোভাবাজারের সংবর্ধনা সভায় তিনি দেশের যুবকদের

উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: 'আমি তোমাদের কাছে এই গরীব, অশিক্ষিত, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য আমার অন্তরের সহানুভূতি, আমার সকল প্রয়াস দায়স্বরূপ অর্জন করছি···তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীদের উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর, তাহলেই বুঝব তোমরা আমাকে যথার্থ ভালবাস।'

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সকলে শুনল সন্ন্যাসীর মুখে এই অভিনব কথা।

ভগবান নয়, ধর্ম নয়, পরলোক নয়, এমন কি পূজা-অর্চনা বা শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বললেন না। বললেন শুধু ভারতের অগণিত দরিদ্র, অস্পৃশ্য নিপীড়িত আর বুভুক্ষু মানুষের কথা। বললেন: 'দরিদ্র-নারায়ণের সেবার চেয়ে আর কোনো বড় ধর্ম নেই। তাদের উন্নতিই আমার দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন।'

রামকৃষ্ণ সন্তানের যোগ্য কথা।

গুরুভাইদের তিনি বললেন, ব্যক্তিগত ধ্যানতপস্যা বা মুক্তিলাভের চেষ্টা এখন থাক, এসো আমরা সবাই ঠাকুরের অভিপ্রায় সাধন করি—দেশে দেশে শিক্ষাবিস্তার আর সেবার কাজে লেগে যাই। ভারতের কল্যাণের জন্য এমন একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আমি গড়ে তুলতে চাই যারা ভগবানের নয়, মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে।'

মর্মস্পর্শী এই আবেদন অনুপ্রাণিত করে তোলে গুরুভাইদের।

তাঁরা মেনে নিলেন তাঁদের নেতার কথা—তাঁর এই নির্দেশ।

এর অল্পদিন পরেই বাংলার মাটিতে গড়ে উঠলো রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। সেবাধর্মের পতাকা হাতে নিয়ে ভারতবাসীর সামনে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভক্তি মুক্তির কামনা ত্যাগ করে দরিদ্র নারায়ণের সেবায় উৎসর্গ করলেন তাঁর জীবন। ধীরে ধীরে শতাব্দীর পটে ফুটে উঠতে থাকে অপূর্ব রঙে ও রেখায় করুণা ও মমতার একটি ছবি। এমন ছবি করুণার প্রতিমূর্তি তথাগত বুদ্ধের পর ভারতবাসী এই প্রথম প্রত্যক্ষ করল।

এই সময়কার একটি ঘটনা।

য়ুরোপ থেকে ফিরে আসার অল্পদিন পরে একটু বিশ্রাম লাভের জন্য স্বামীজি দার্জিলিঙ্ গেলেন। সেখানে থাকতেই খবর পেলেন যে, কলকাতায় মহামারীরূপে প্লেগ দেখা দিয়েছে। রাস্তাঘাট আবর্জনায় ভরে গেছে। পরিষ্কার করবার জন্য লোকের অভাব। অনেকে শহর ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে গেছে। খবর পেয়ে স্বামীজি চলে এলেন দার্জিলিঙ্ থেকে। গুরুভাইদের নিয়ে শুরু করে দিলেন সংকট ত্রাণের কাজ। বাগবাজার এলাকায় শুরু হয় রিলিফের কাজ সন্ন্যাসীদের তত্ত্বাবধানে। এত বড় একটা কাজ হাতে নিলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু টাকা কোথায়? এক গুরুভাই তাঁকে বলেন, নরেন প্লেগ-রিলিফের কাজ যে করব আমরা তার জন্য টাকা পাব কোথায়?

—টাকা! কেন, দরকার হলে মঠের জমি বিক্রী করে দেব। তাই বলে আর্তত্রাণের এই কাজ বন্ধ থাকবে?

স্বামীজির মুখে এই কথা শুনে সবাই বিস্মিত হয়।

এমনি করেই তিনি সেবাধর্মের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তাঁর দেশ-বাসীর সামনে। তাঁর এই মহাপ্রাণতায় সেদিন সকলেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয় বিবেকানন্দের।

মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি প্রচার কার্য সুবিধা হবে বলে বাংলা ও ইংরেজিতে দু'খানা মাসিক পত্রিকা বের করলেন। ১৮৯৮ সালে ইংরেজিতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' আর পরের বছরে বাংলায় উদ্বোধন প্রকাশিত হলো। ১৮৯৮ সালে গঙ্গার তীরে বেলুড় মঠ স্থাপিত হয়। এখানে নীলাম্বর মুখার্জির একটা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি ছিল। উনচল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে সেই বাইশ বিঘা জমিটা কেনা হয়। স্বামীজির এক ধনী মার্কিন শিষ্যা, মিস হেনরিয়েটা মুলার এই টাকাটা দিয়ে ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই মঠের বাড়ি তৈরি হয়। মঠ তৈরির টাকা দিলেন মিসেস ওলে বুল।

মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হলো।

এইবার রামকৃষ্ণের আদর্শকে প্রচার করতে হবে দেশে বিদেশে।

তার সূচনা তো তিনি করে এসেছেন দুই মহাদেশে; এখন সেই কাজের ধারা যাতে অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে সেজন্য কয়েকজন গুরুভাইকে আমেরিকা ও য়ুরোপে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। মঠ ও মিশনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নিজে না হয়ে ঐ কাজের দায়িত্ব দিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের ওপর। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে ইনি রাখাল মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন; আর বিবেকানন্দ তাঁকে ডাকতেন 'রাজা' বলে। মঠ ও মিশন স্থাপন করার পর মাত্র চার বছর স্বামীজি সশরীরে বর্তমান ছিলেন। তাই এই মঠ ও মিশনের প্রকৃত নির্মাতা ছিলেন রাখাল মহারাজ।

বিবেকানন্দের প্রচার-ব্রতকে সার্থক করবার জন্য তাঁর গুরুভাইরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। সারদানন্দ আর অভেদানন্দকে বেদান্ত প্রচারের জন্য তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা পাঠালেন। সিংহলে পাঠালেন শিবানন্দকে, মাদ্রাজে শশী মহারাজকে। তাঁরা সকলেই উদ্বুদ্ধ হলেন তাঁদের প্রিয় নেতার আদর্শে। এই আদর্শের ধারা সেই থেকে অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্মব্রত তাঁর অকাল মৃত্যুতে অসমাপ্ত থেকে যায়নি—তাঁরই গুরুভাই ও তাঁদের শিষ্যদের ভেতর দিয়ে তা সমাপ্তির পথে অগ্রসর হতে থাকে।

স্বামীজির আহ্বানে যে কয়জন বিদেশিনী মহিলা এই সময়ে ভারতবর্ষে এসে ভারতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ছিলেন প্রধান। তিনি 'ভগিনী নিবেদিতা' এই নামে এই দেশে পরিচিতা, এ নাম তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে দিয়েছিলেন—এই নামের মধ্যেই হয়েছিল নবজন্ম। এই ভারত সেবিকা ভারতের সেবায় নিজের জীবনকে যেভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন সে ইতিহাস জানবার মতো। আমেরিকা থেকে এলেন সিস্টার

ক্রিশ্চিয়ানা। এরা দু'জনেই বেলুড়ে এসে বাস করেন। নিবেদিতাকে বিবেকানন্দ শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে তাঁর মনের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁরই ওপর তিনি মেয়েদের শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন। বাগবাজারে একটি স্কুলের দায়িত্ব নিবেদিতার ওপর তিনি অর্পণ করেন। সেই স্কুলটিই এখন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।

কুমারী মার্গারেটকে ব্রহ্মচারিণী রূপে দীক্ষিত করবার সময় স্বামীজি তাঁকে বলেছিলেন ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তোমাকে সর্বসুখে জলাঞ্জলি দিতে হবে। বলো, পারবে?

অবিচলিত কণ্ঠে নিবেদিতা উত্তর দিয়েছিলেন—পারব।

সেদিন থেকে বিবেকানন্দের ভারত-মন্ত্র নিবেদিতার জপের মন্ত্র হয়েছিল।

নয়

বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

স্বামী বিবেকানন্দের এই ছুটিই হলো প্রধান কর্মকীর্তি।

মঠ ও মিশন স্থাপিত হওয়ার পর থেকে তাঁর কাজ খুব বেড়ে যায়। এতটুকু বিশ্রাম নেই। সেই গুরুভার পরিশ্রম তাঁর কর্মক্লান্ত দেহে বেশিদিন সহ্য হলো না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে শিষ্য ও গুরুভাইরা শংকিত হলেন। চিকিৎসক এলেন। পরীক্ষা করে বললেন, অসুখ এমন কিছু গুরুতর নয়, তবে এখন দরকার বায়ু-পরিবর্তন আর কিছুদিন বিশ্রাম। ঠিক হলো কলকাতা ত্যাগ করে স্বামীজি কিছুদিনের জন্য হিমালয়ের কাছে আলমোড়া গিয়ে থাকবেন। তখন সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রটির নাম 'অদ্বৈত আশ্রম'। এখানে রামকৃষ্ণের চিত্র বা মূর্তিপূজা হয় না।

আলমোড়ার স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশে কিছুকাল বাস করার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হলো। আড়াই মাস কাল এখানে কাটিয়ে তিনি এলেন পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে। এখানে তিনি তাঁর শিষ্যা নিবেদিতাকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। কাশ্মীরে তিনি তুষার-তীর্থ অমরনাথ ও

ক্ষীরভবানী দর্শন করেন। বিশাল গুহার মধ্যে তুষারময় শিবলিঙ্গ—সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করে না। অসংখ্য তীর্থযাত্রীর মধ্যে স্বামীজিও একজন। সমস্ত শরীর ছাইমাখা, পরণে একটিমাত্র কৌপিন। মুখখানি ভক্তিভরে উজ্জ্বল। হাতে জপের মালা। গুরুর এই মূর্তি দেখে শিষ্যা মুগ্ধ বিস্মিত হয়েছিলেন।

তীর্থযাত্রা শেষ করে স্বামীজি ফিরলেন কলকাতায়।

উনিশ শতকের শেষ বছর।

বিবেকানন্দ আবার পৃথিবী ভ্রমণে বের হলেন। সঙ্গে নিলেন নিবেদিতাকে। যাবার আগে একদিন বেলুড় মঠে সমবেত ভক্ত ও শিষ্যদের উদ্দেশে তিনি বক্তৃতা দিলেন। বললেন, 'বাবা সব তোরা মানুষ হ—এই আমি চাই। এর কিছু মাত্র সফল হলে আমার জন্ম সার্থক হবে। ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার জন্য যত্নবান হও—জীবনে কর্মের ও বৈরাগ্যের সমাবেশ করো।

১৮৯৯, জুন মাস।

'গোলকুণ্ডা' জাহাজে চড়ে স্বামী বিবেকানন্দ চলেছেন য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে। একদিন জাহাজে কথা প্রসঙ্গে তিনি নিবেদিতাকে বললেন—যতই দিন যাচ্ছে ততই আমি বুঝতে পারছি একমাত্র পৌরুষ লাভই জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাধনা। এই কথাই আমি পৃথিবীতে প্রচার করছি।

—আপনার জীবনের আদর্শ কি, আচার্যদেব?

—মানুষ গড়াই আমার জীবনের ব্রত। আমার বিশ্বাস সত্যিকার মানুষ তৈরি হলে জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি দুই-ই সুনিশ্চিত।

—শিক্ষার অর্থ কি?

—মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।

লণ্ডনে পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই আমেরিকা থেকে আহ্বান এলো। স্বামীজি চললেন আমেরিকায়। সঙ্গে নিবেদিতা। জাহাজে শিষ্যার সঙ্গে কত বিষয়ের আলোচনা হতো। নিবেদিতা প্রশ্ন

করতেন, গুরু উত্তর দিতেন। কখনো কখনো গীতা ও উপনিষদ থেকে আবৃত্তি ও অনুবাদ করে শোনাতেন। এমনি করেই তিনি তাঁর এই মানসকন্যাকে তৈরি করেছিলেন। সমুদ্র যেমন শান্ত ও স্থির, সমুদ্রপথে স্বামীজিকেও ঠিক সেই রকম শান্ত ও স্থির দেখাতো।

আমেরিকায় পৌঁছলেন বিবেকানন্দ।

সেবার এসেছিলেন একজন অপরিচিত আগন্তুক হিসাবে, এবার জাহাজঘাটেই হলো তাঁর রাজকীয় অভ্যর্থনা। এই কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি দেখলেন গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দের চেষ্টায় বেদান্ত প্রচারের কাজ বেশ এগিয়ে গেছে। খুব খুশি হলেন। এইবার স্বামীজি তাঁর মার্কিন শিষ্যদের সাহায্যে নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি শহরে বেদান্ত প্রচারের কয়েকটি স্থায়ীকেন্দ্র খুললেন। মিলিত হলেন ভক্তদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে। ক্যালিফোর্ণিয়ার রাজধানী স্যানফ্রানসিস্‌কো, ওকল্যাণ্ড আর ভারতবর্ষে মায়াবতী (আলমোড়া)—এই তিনটি স্থানে স্বামীজি বেঁচে থাকতেই বিশুদ্ধ অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারের জন্য তিনটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

১৯০০ সাল। জুলাই মাস।

প্যারিস থেকে নিমন্ত্রণ এলো আন্তর্জাতিক ধর্মসভায় বক্তৃতা করবার জন্য। সে নিমন্ত্রণ বিবেকানন্দ গ্রহণ করলেন। ধর্ম, ইতিহাস ও বিজ্ঞান—এই তিনটি বিষয়ের এই স্মরণীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশনে দু'জন বাঙালী সন্তান ভারতের গৌরব পতাকা তুলে ধরেছিলেন। ধর্মে—বিবেকানন্দ, বিজ্ঞানে—জগদীশচন্দ্র বসু। এঁরা দুজনেই সেদিন নিজ নিজ প্রতিভায় পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁদের কৃতিত্ব ও সাফল্য লাভ সেদিন ভারতের মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন সঞ্চার করেছিল। সে ইতিহাস কোনো দিনই ভুলবার নয়।

রাত আটটা। বেলুড়মঠ।

ঠাকুরের সন্ধ্যারতি তখন হয়ে গিয়েছে। মঠের লোকজন যে যার

কাজে ব্যস্ত। সদর দরজায় তালা বন্ধ। নির্জন স্থান—তাই এরই মধ্যে চারদিক নিস্তব্ধ। সবেমাত্র নৈশ আহারের ঘণ্টা পড়েছে। এমন সময়ে মালী এসে মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে খবর দেয়, একজন সাহেব এসেছেন গাড়ি করে। তিনি ভেতরে আসতে চান।

—সাহেব। এত রাতে।

গুরুভাইদের বিস্ময়ের সীমা নেই। এত রাতে তো কোনো সাহেবের এখানে আসার কথা নেই।

—তুই ঠিক বলছিস, সাহেব মানুষ?

—হ্যাঁ, সাহেবই তো হ্যাট-কোট-পরা।

—আচ্ছা যা, চাবি নিয়ে যা। দরজা খুলে সাহেবকে নিয়ে আয় এইখানে।

চাবি থাকে স্বামী প্রেমানন্দের কাছে। তিনি মালীকে চাবি এনে দিলেন। চাবি নিয়ে মালী বাইরে এসে দেখে গাড়ি নেই, সাহেবও নেই। সে আবার ছুটে আসে এই অদ্ভুত খবর দিতে। খবর কিন্তু আর দিতে হলো না। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং একেবারে খাবার ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত।

—একী, নরেন!

মঠের সন্ন্যাসীরা সবিস্ময়ে বলে ওঠেন একবাক্যে।

—হ্যাঁ, রাখাল, আমিই তো। শিশুর মতো হেসে বলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

—বাইরে সদর দরজা খুলতে দেরী হচ্ছিল, এদিকে তোমাদের খাবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। পাছে আমি বাদ যাই, তাই পাঁচিল টপকে এলাম।

—বেশ করেছ। বসে যাও—

নিশ্চয়ই, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

চারদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সকলের সঙ্গে বসে স্বামীজি কলার পাতায় ঠাকুরকে নিবেদন করা খিচুড়ী ভোগ খেলেন পরম তৃপ্তির সঙ্গে।

প্যারিসে প্রায় তিন মাস কাটিয়ে বিবেকানন্দ অবশেষে ভারতের অভিমুখে যাত্রা করেন। এইবার তিনি ফিরবার পথে ভিয়েনা, এথেন্স, কনস্টান্টিনোপাল, মিশরের রাজধানী কায়রো প্রভৃতি শহরগুলি দর্শন করেন। ঠিক কবে দেশে ফিরবেন কেউ জানত না। তিনি ইচ্ছা করেই এবার কাউকে কোনো খবর দেননি। পাছে আগে থেকে খবর দিলে অভ্যর্থনার আয়োজন হয়, তাই এবার তিনি এইভাবে ফিরে এসেছিলেন। জাহাজ থেকে বোম্বাইয়ে নামেন। সেখান থেকে ট্রেনে সোজা কলকাতা। হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি করে একেবারে বেলুড়। পাছে কেউ চিনতে পারে তাই গৈরিক বসন ছেড়ে কোট-প্যান্ট পরেছিলেন। দিব্যকান্তি চেহারা, সাহেবী পোশাকে তাঁকে মানাত খুব সুন্দর।

বেলুড়ে দিনকতক গুরুভাইদের সঙ্গে কাটিয়ে স্বামীজি এলেন আলমোড়ায় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে। এইখানে একদিন তাঁর এক গুরুভাইকে কথায় কথায় বললেন, আমার শরীর সত্যিই ভেঙে পড়েছে। আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। এখন কি ইচ্ছা হয় জানো, সব কাজকর্ম ছেড়ে মঠে গিয়ে একটু নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করি।

কিন্তু জগন্মাতা তাঁর এই সন্তানের ভাগ্যে বিশ্রাম সুখ লেখেন নি। অসংখ্য কাজের মধ্যে সন্ন্যাসীর অবসর কোথায়?

মায়াবতী মঠে কিছুদিন কাটিয়ে ১৯০১ সালের প্রথম ভাগেই তিনি বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। যেখানেই থাকুন, বিবেকানন্দের মনটি পড়ে থাকত এইখানে। এবার আহ্বান এলো পূর্ববঙ্গ ও আসাম থেকে। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা তখন দিন দিন খারাপের দিকে। তবু মার্চ মাসের মাঝামাঝি বিবেকানন্দ শিষ্যদের নিয়ে ঢাকা যাত্রা করলেন। লাঙলবন্ধে এসে পবিত্র ব্রহ্মপুত্রে স্নান করলেন। ঢাকাতেও তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ শেষে তিনি এলেন আসামে। এখানে কামাখ্যা মন্দির দর্শন করে কিছুদিন শিলং-এ কাটিয়ে তিনি অবশেষে ফিরলেন বেলুড় মঠে। বাহান্ন পীঠস্থানের মধ্যে কামাখ্যা হলো একটি।

অক্টোবর মাসে বিবেকানন্দের রোগ বৃদ্ধি পেল।

গুরুভাইরা শংকিত হলেন।

অসুস্থ শরীরেও স্বামীজির কাজের বিরাম ছিল না।

মঠের উন্নতির কথা চিন্তা করা, ক্রমাগত লোকজনকে উপদেশ দেওয়ার ভেতর দিয়ে তাঁর জীবনের দিনগুলি এখন অতিবাহিত হয়। মঠকে জনপ্রিয় করার জন্য খুব ধূমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতির প্রবর্তন করলেন। আগেই বলেছি, স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক সাধারণ পর্যায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁর গৈরিক বাসের অন্তরালে ছিল একাধারে মানবপ্রেমিক ও ভারতপ্রেমিক এক হৃদয়বান সন্ন্যাসী তিনি এমন একটি হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, যা মানুষের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।

কেবলমাত্র রামকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করা অথবা তাঁর গুরুভাইদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য তিনি যে মঠ স্থাপন করেছিলেন তা নয়। এই মঠ স্থাপন করার পেছনে স্বামীজির একটা বিরাট পরিকল্পনা ছিল। এই মঠ ও মিশনকে কেন্দ্র করে তিনি চেয়েছিলেন এই দেশে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত উপযুক্ত মানুষ তৈরি করতে। পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরে আসার পর থেকে তাঁর সকল চিন্তা, সকল উদ্যম একটিমাত্র চিন্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল—দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। যখন তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতাকে দিয়ে বাগবাজারে মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপিত হয়, তার উদ্বোধনের দিন স্বামীজি বলেছিলেন : 'আমি চাই এমন শিক্ষা-ব্যবস্থা যা তৈরি করবে ভারতের খাঁটি ছেলে মেয়ে, য়ুরোপের নকল নয়।'

একটি চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, আমি য়ুরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতাম।' কেন করতেন, জানো ? এদেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব দেখে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়। সেই সঙ্গে তিনি শরীর চর্চাও

করতে চিন্তা করতেন। তাঁর অনেক বক্তৃতায় আছে তিনি দেশের যুবকদের শরীর চর্চার জন্য বার বার বলেছেন। দুর্বল মানুষের ধর্মে অধিকার নেই এমন কথা তাঁর আগে কাউকে আমরা বলতে শুনিনি। একবার কলকাতায় ছাত্রদের এক সভায় স্বামীজি বলেছিলেন ঃ ছেলেরা তোমরা ফুটবল খেলো। গীতা পাঠ করার প্রয়োজন নেই তোমাদের ; গীতা পাঠে তোমাদের মোক্ষলাভ ঘটবে না ; ফুটবল খেলেই তোমরা স্বর্গে যেতে পারবে।'

ছেলেদের জন্য যেমন, তেমনি মেয়েদের উন্নতির কথাও তিনি চিন্তা করতেন। ভারতবর্ষের মেয়েদের জন্য তিনি এমন শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন যার সাহায্যে তাঁরা পবিত্র, সংযত নিঃস্বার্থপর ও ধর্মপরায়ণী হয়ে উঠবেন এবং তাঁদের সন্তানদের মধ্যে বল ও উৎসাহ ঢেলে দিতে পারবেন। সমাজজীবনে মেয়েদের উন্নতির কথা চিন্তা না করে ছেলেদের উন্নতির কথা চিন্তা করলে সমাজ সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারে না। এই কথা স্বামীজি খুব প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতেন এবং এই দেশের মেয়েরা শিক্ষায় উন্নত হয়ে যাতে সিংহিনীর মতো হতে পারে এই আশা বুকে নিয়ে তিনি তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার চাইতেন।

সন্ন্যাসীর চোখে দেশ বলতে শুধু আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত একখণ্ড ভূভাগ নয় ; তাঁর দেশ, দেশের জনসাধারণ, দেশের সাধারণ মানুষ। এদের সর্বপ্রকার মুক্তিই ছিল তাঁর সারাজীবনের সাধনা। বলতেন, 'এরাই তো জাতির মেরুদণ্ড। এরা যদি আলো না পায়, এদের যদি জাগানো না যায়, এদের যদি আপন জন বলে গ্রহণ করে পাশে স্থান দেওয়া না হয়। তাহলে ভারতবর্ষ জাগবে না।'

এই মর্মবেদনা বুকে নিয়ে তিনি বলতেন ঃ 'এই যে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে রয়েছে যুগ-যুগ ধরে, এদের জন্য কে চিন্তা করে ? যে ঈশ্বর ইহলোকে জনসাধারণকে খাদ্য দিতে পারে না, স্বর্গে গেলে তিনি তাদের অনন্ত শান্তি দেবেন, তেমন কথা আমি বিশ্বাস করি

না।' খাদ্য এবং শিক্ষা জনসাধারণের এই দুটি প্রয়োজনের কথা হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে সারা জীবন ধরে বলে গিয়েছেন এই সন্ন্যাসী। একদিকে কর্ম, অন্যদিকে বৈরাগ্য-এই হলো বিবেকানন্দ।

শতাব্দীর অন্তিম প্রহর বিঘোষিত হয়েছে।

আর অল্পদিন পরেই আরেকটি নতুন শতাব্দীর আবির্ভাব হবে মহাকালের রঙ্গমঞ্চে। সন্ধ্যার ম্লান আলোকে গঙ্গার তীরে পায়চারি করছেন গৈরিকধারী এক সন্ন্যাসী। ওষ্ঠে তাঁর শিবের কাঠিন্য; চোখে বুদ্ধের করুণা। দুইটি বিষন্ন ভ্রূতে কৈলাসের নীলকণ্ঠ স্মৃতি। শান্ত পূরবীর সন্বিতে তাঁর প্রশস্ত ললাট যেন ঈষৎ কুঞ্চিত। অন্তরে কল্লোলিত প্রাণ-সমুদ্র। তাঁর দীর্ঘ দেহ জ্ঞানভারে নত। স্থির সাধনার একনিষ্ঠ অনলে পরিশুদ্ধ তাঁর আত্মা। হিমগিরি শীর্ষের তুষারের শান্তি যেন গলে পড়েছে তাঁর প্রেমের মধ্যে। এক শতাব্দী থেকে আরেকটি শতাব্দীর পানে তিনি হেঁটে চলেছেন কণ্ঠে এই অগ্নিময় বাণী নিয়েঃ ওঠো, জাগো মানুষ হও।

১৯০২ সাল। স্বামীজির জীবনের শেষ বৎসর।

জানুআরি মাসে বেলুড় মঠে দু'জন জাপানী পণ্ডিত এলেন। তাঁদের সঙ্গে বিবেকানন্দ বারাণসী ও বুদ্ধগয়া দর্শনে গেলেন। প্রথমে এলেন বুদ্ধগয়ায়। ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। একদিন তিনি নিবেদিতাকে বুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'আমি ভগবান বুদ্ধের দাসানুদাস। তাঁর সমতুল্য এ পর্যন্ত কে হয়েছে? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—নিজের জন্য কখনো একটি কাজ করেননি। বিশাল হৃদয় দিয়ে সমস্ত জগৎকেই আলিঙ্গন করেছিলেন তিনি। বাল্যকালে এই অধমকে একদিন দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন।'

বুদ্ধগয়া থেকে স্বামীজি এলেন কাশীধামে। এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এলেন বেলুড়ে। এইবার কাশীতে তিনি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। দিন যায়। তাঁর শরীর ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এপ্রিল মাসে তিনি বিশেষভাবে পীড়িত হলেন। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীজি নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে আর দেরী নেই। মৃত্যু আসন্ন। মহাপ্রয়াণের জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন।

বাগবাজার থেকে নিবেদিতা এলেন একদিন বেলুড়ে অসুস্থ আচার্য দেবকে দর্শন করতে, প্রণাম করতে। 'এখন কেমন বোধ করছেন?'

—শিষ্যার এই প্রশ্নের উত্তর স্বামীজি শান্তকণ্ঠে বললেন : 'আমি এইবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। একটা মহাতপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে জেগেছে।'

৩রা জু লাই। ১৯০২ সাল।

স্বামীজি সেদিন নিজের হাতে পরিবেশন করে শিষ্যদের যত্নের সঙ্গে খাওয়ালেন এবং খাওয়া শেষ হলে নিজে তাদের হাতে জল ঢেলে দিলেন। সেদিন বেলুড়ে নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে চকিতে তাঁর মনে পড়ল—মারা যাবার আগে যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। তবে কি আচার্যদেব সত্যিই এবার দেহরক্ষা করবেন!

১৯০২। ৪ঠা জুলাই। শুক্রবার।

স্বামীজির জীবনের শেষ প্রভাত।

প্রত্যুষে তিনি ঘুম থেকে উঠলেন। কিন্তু অন্য দিনের মতো আজ আর তিনি সকলের সঙ্গে ধ্যান করতে বসলেন না। সবাই একসঙ্গে বসে ধ্যান করার প্রথাটা তিনিই মঠে প্রবর্তন করেছিলেন। এমন ব্যতিক্রম তাঁর জীবনে এই প্রথম। শিষ্য ও গুরুভাইদের নিয়ে নানারকম গল্প করতে লাগলেন। একটু বেলা হলে এক বাটি চা পান করলেন। একটু তামাক সেবন করলেন। তারপর তিনি ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এমন তো তিনি কোনদিন করেন না।

আজ তবে করলেন কেন?

ব্যাকুল প্রশ্ন জাগে শিষ্য ও সেবকদের মনে। প্রশ্ন জাগে তাঁর প্রিয়তম গুরুভাইদেরও মনে। এইভাবে তিন ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি বেয়ে তিনি নীচে নেমে এলেন। সামনেই খোলা মাঠ; মাঠের ওপর নরম সবুজ ঘাসের জাজিম বিছানো। তারই ওপর পায়চারি করছেন আর আপনমনে গুণ গুণ করে গাইছেন: 'মন চলো নিজ নিকেতনে।'

একদিন বালক নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের সম্মুখে বসে এই গানটি গেয়েছিলেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে এই গানটি শুনে ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়েছিল—তিনি একদৃষ্টিতে তখন তাকিয়ে ছিলেন তাঁর চিহ্নিত মানসপুত্রের লাবণ্যমণ্ডিত মুখের পানে। আজ জীবন সন্ধ্যায় বিশ্ববরেণ্য

সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শোনা গেল সেই গান—'মন, চলো নিজ নিকেতনে।'

গুণগুণ করে গাওয়া শেষ হলো।

ধীর মন্থর পদক্ষেপে পায়চারি করেন।

সম্মুখে তেমনি ধীরে কুল কুল শব্দে বয়ে চলেছে ভাগীরথী।

স্বামীজি পায়চারি করছেন আর অস্ফুটস্বরে নিজের মনে বলছেন ঃ যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকত তাহলে সে বুঝতে পারত এই বিবেকানন্দ কী জন্য এসেছিল আর কী করে গেল।

দুপুরবেলা।

মঠে খাবার ঘণ্টা পড়ল।

শেষবারের মতো শুনলেন বিবেকানন্দ সেই পরিচিত ঘণ্টাধ্বনি। শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এলেন নীচের বারান্দায়। বসলেন পঙক্তি ভোজনে। সকলের সঙ্গে বসে সেই তাঁর শেষ আহার। অসুস্থ হওয়ার পর থেকে ইদানিং তিনি এইভাবে আহার করতেন না। আজ হঠাৎ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কেন? কিন্তু কারো মনে কোনো সন্দেহ দেখা দিল না, বরং তাঁর সঙ্গে একত্রে বসে খাওয়ার সৌভাগ্য-লাভে সবাই যেন আজ খুব আনন্দিত হলেন।

—আজ কেমন আছেন, স্বামীজি? জিজ্ঞাসা করেন এক ব্রহ্মচারী শিষ্য।

—অন্যদিনের চেয়ে আজ খুব ভালো আছি।

আহারের পর আধঘণ্টা বিশ্রাম করলেন। তারপর মঠের তরুণ ব্রহ্মচারীদের নিয়ে সংস্কৃত পড়াতে আরম্ভ করলেন। বিকেল হলো। স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মঠের বাইরে বেড়াতে বেরুলেন। বেড়াতে বেড়াতে দু'জনে একেবারে বেলুড় বাজার পর্যন্ত চলে এলেন। বেড়িয়ে যখন ফিরলেন তখন ঠাকুরের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয়েছে। আরতি হয়ে গেল। ব্রহ্মচারীরা একে একে এসে তাঁকে প্রণাম করে যায়। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ ধীরে ধীরে নিজের শোবার ঘরটিতে এলেন। গঙ্গার দিকে মুখ করে ধ্যানে বসলেন। গঙ্গার ওপারে দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য সাধন পীঠ। একঘণ্টা পরে তাঁর ধ্যান ভাঙ্গল। সেবক ব্রহ্মচারীটিকে বললেন, 'ওরে, জানালাগুলো সব এবার খুলে দে।'

বাইরে জমাট অন্ধকার।

নিস্তরঙ্গ গঙ্গার জলে আলোর প্রতিবিম্ব কাঁপছে।

ওপরের আকাশে মিট মিট করে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র।

সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন জানালার কাছে।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকালেন তিনি পরপারে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যেখান থেকে একদিন শুরু হয়েছিল তাঁর অধ্যাত্মজীবনের জয়যাত্রা।

তারপর তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। তুলে নিলেন হাতে জপের মালা। বসলেন পদ্মাসনে। একঘণ্টা পরে ধ্যান ভাঙল। এবার তিনি শুয়ে পড়লেন মেঝের ওপর বিছানো অজিন শয্যায়। সেই তাঁর শেষ শয়ন

রাত ন'টা। চরাচর নিস্তব্ধ।

নীচে কুল কুল শব্দে বয়ে চলেছে ভাগীরথী।

বিবেকানন্দের মাথা একটু হেলে পড়ল।

দেহ নিস্পন্দ ও স্থির।

সন্ন্যাসী মহাপ্রয়াণ করলেন তাঁর নির্জন কক্ষে।

চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন বাংলার বুকভরা নিধি, বেদান্তবীর বিবেকানন্দ।

ক্লান্ত শিশু যেন মায়ের কোলে ঘুমুচ্ছেন-হাতে জপের মালা।

বাংলায় স্বদেশীযুগের উষাকে আহ্বান করে বিংশ শতাব্দীকে স্পর্শ করে ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ।

বাংলা তথা ভারতবর্ষে এক নবযুগের সূচনা করে দিয়ে, মানব-সেবার মন্ত্রে তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের সামনে কর্মের এক নতুন আদর্শ রেখে দিয়ে, মহাপ্রয়াণ করলেন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও স্বদেশপ্রেমের নবীন বিগ্রহ, নর-কেশরী বিবেকানন্দ।

আমাদের জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসেছিলেন এই যুগপুরুষ। তিনি ছিলেন মানবতার পুরোহিত। পরিব্রাজক জীবনে তিনি ভারতবর্ষের পঙ্গু বুভুক্ষু, নিপীড়িতদের পরিচয় পেলেন ; চিনলেন দরিদ্র-নারায়ণকে—ভালবাসলেন, শ্রদ্ধা করলেন তাকে, টেনে নিলেন বুকে। তাঁর হৃদয়বীণার তারে তারে বেজে উঠেছিল এক নতুন রাগিনী, নতুন সুর—মনুষ্যত্বের জয়গানে তা ছিল পূর্ণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ভগবানকে। তাইতো তিনি মানুষের সেবায় অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বহুসাধের মুক্তি সাধনা। দেশসেবার মহাযজ্ঞে তিনি দিয়ে গেছেন আত্মাহুতি। আজ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমরা বলব :

দুঃখের দুর্গম পথ দিয়া তুমি,
নির্ভীক পরাণে করে গেলে মধুময় বিশ্বভূমি,
সত্যেরে জাগ্রত করি।

বিবেক-বাণী

[১] বহুরূপে সম্মুখে তোমা ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

[২] হে বীর। সাহস অবলম্বন করো। সদর্পে বলো, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো, ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই। তুমি সদর্পে বলো, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ আর বলো দিন রাত, মা, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।

[৩] শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। সেই-ই নাস্তিক, যে নিজের উপর বিশ্বাস রাখে না।

[৪] যদি ভগবান বলে কেউ থাকেন তাঁকে আমাদের দেখতে হবে, আত্মাকে অনুভব করতে হবে আমাদের মধ্যে। যদি তা' না হয়, তবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করাও ভালো। যদি কোন

ভগবান থাকেন, তবে তিনি আমাদের অন্তরের গভীরেই আছেন।

[৫] ধর্মকে উপলব্ধি কর, কেবল কথায় কিছু হয় না। ধর্ম কথা শোনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার ফেকচারে বিশেষ কোন ফল হবে না।

[৬] পৃথিবীতে চালাকি দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না।

[৭] হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য দেবতা উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর।

[৮] ত্যাগ ছাড়া পৃথিবীর কোনো মহৎ কর্মই সাধিত হয় নি।

[৯] আগে কর্ম, পরে ধর্ম। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ কর্মে। আগে সমাজসেবা, পরে আত্মসেবা।

[১০] এস, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালোবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য —উন্নত হবার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করি।

[১১] পেছনে চেও না—অতিপ্রিয় আত্মীয় স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।

ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।

[১২] বিস্তৃতিই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু। প্রেমই বিস্তৃতির লক্ষণ ও সর্বপ্রকার স্বার্থপরতাই মৃত্যু। যদি জগতে কোন পাপ থাকে, তবে তাহা দুর্বলতা। সকল প্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর, যেহেতু দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু।

[১৩ নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও, যাহা কিছু পার স্বীকরণ করিয়া লও, প্রত্যেক জাতির নিকট হইতেই শিক্ষালাভ কর এবং যাহা কিছু প্রয়োজনীয় গ্রহণ কর।

[১৪] পৃথিবীতে কোন ধর্ম হিন্দুধর্মের ন্যায় মানবতার মহিমা এরূপ উচ্চভাবে ঘোষণা করে নাই, আবার পৃথিবীর কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের ন্যায় নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণীকে এভাবে পদদলিত করে নাই।

[১৫] পরের মুখাপেক্ষী হয়ে কেন জীবন ধারণ করবি? আগে অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর। ধর্ম-কর্ম এখন গঙ্গার জলে ভাসিয়ে আগে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হ। ওরে ধর্ম-কর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই, পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির।

[১৬] আমি মানুষ চাই—চাই মানুষ—মানুষ খুঁজতে আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি ভারতবর্ষের লোককে মানুষের ভেতর মানুষ হতে দেখতে চাই; দেবতা দেখতে চাই না।

তন্ত্রমন্ত্রে কোন কাজ উদ্ধার করতে চাই না। মানুষের মত সকল কাজ করতে চাই।

[১৭] তোমরা সর্বাগ্রে সবল হও। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের অধিকতর নিকটবর্তী হতে পারবে। তোমাদের শরীর একটু শক্ত হলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝবে। গীতা বীরের ধর্ম গ্রন্থ। স্বাস্থ্যহীন কাপুরুষের গীতা স্পর্শের অধিকার নেই।

[১৮] সব সময় বিশ্বাস রাখবি ভগবানের উপর। তাহলেই দেখবি দুনিয়াটা তোর পায়ের তলায়।

[১৯] প্রত্যেক রমণীকে জননী বলিয়া চিন্তা কর।

[২০] উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান
হিমাদ্রি-শিখরে উঠিল যে গান—
গম্ভীর অরণ্যে, পর্বত প্রদেশ,
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে—
সে সংগীত-ধ্বনি প্রশান্ত লহরী
সংসারের রোল ওঠে ভেদ করি
কাঞ্চন কি কাম কিংবা যশ-আশ,
যাইতে না পারে কভু যার পাশ,
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী
সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি—
উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও, গাও সেই গান
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

———